# মরীচিকা

## শারদীয়া

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

# Message from
# Morichika Founders & Directors

**A Warm Welcome from the Morichika Family to Durga Puja 2026**

Dear Morichika Family and Friends,

It is with immense pride, gratitude, and excitement that we welcome you to the very first edition of the Morichika Magazine.

What began as a simple vision—to create a platform that celebrates and preserves our rich Bengali heritage while fostering a sense of community and belonging—has grown into a vibrant organization powered by the passion, dedication, and support of countless volunteers, families, and well-wishers. This magazine marks another important milestone in that journey.

Morichika was founded on the belief that culture is more than traditions and festivals; it is the stories we share, the values we pass on to the next generation, and the connections we build with one another. Through our cultural programs, educational initiatives, community service, and celebrations, we strive to create a welcoming environment where people of all ages can learn, participate, and take pride in their roots.

This inaugural magazine is a reflection of that spirit. Within these pages, you will find memories of our events, achievements of our members, creative contributions from talented individuals, and stories that showcase the diversity and strength of our community. It serves not only as a record of our accomplishments but also as a testament to the collective effort that makes Morichika special.

As the founders and directors of Morichika, We would like to extend our heartfelt thanks to every volunteer, sponsor, performer, contributor, and supporter who has helped us grow. Your enthusiasm and commitment continue to inspire us and motivate us to reach even greater heights.

As we look ahead, we are confident that Morichika will continue to flourish as a center of culture, friendship, and community engagement. Together, we will preserve our traditions, embrace new ideas, and create lasting memories for generations to come.

Thank you for being part of this journey. We hope you enjoy this first edition of our magazine and feel the same sense of pride and belonging that inspired its creation.

From

**Arunava Saha, Debasish Pai Mazumdar, Purnendu Maiti**

# Meet The Team

**Purnendu Maiti**
President

**Subhendu Ghosh**
Vice President & Magazine

**Saptarshi Roy**
Secretary & Food Co-Ordinator

**Partha Sarathi**
Jt Secretary

**Saubhik Maity**
Treasurer

**Promothes Roy**
Jt. Treasurer

**Naina Ghosh Saha**
Cultural Lead

**Paramita Das**
Cultural Support & Magazine

**Debasish Pai Mazumder**
Sponsorship Outreach

**Shaswati Chaki**
Magazine

**Dipankar Bose**
Magazine

**Debjani Ghosh**
Puja Planning Co-ordinator

**Soumita Maiti**
Puja Co-ordinator Support

**Rajib Banik**
Web

**Soumyodeep Mukherjee**
Web

# Annual Prime Members

Achintya Ghosh

Arunava Saha

Debasish Pai Mazumder

Dipankar Bose

Jayanta Basu

Joydeep Roychowdhury

Partha Sarathi

Priyabrata Palit

Partha Chaudhuri

Purnendu Maiti

Rajib Banik

Saptarshi Roy

Saubhik Maity

Soumyodeep Mukherjee

Subhendu Ghosh

Supratim Samanta

Tania Paul

# Table Of Content


**পূজোর মিলনমেলা** - Raikishori Mitra
**সাতটি পরিবার থেকে আজ ২৫০ মানুষের এক বিশাল পরিবার** - Naina Ghosh Saha
**প্রবাসের মাটিতে এক টুকরো বাংলা** - Shekhar Saha
**Remembrance: A Brief History of Women and Spirituality** - Dr. Ritobrita Chakraborty
**Puja & Plates** - Mishika Ghosh
**ছোট্ট কুঁড়ি** - Bishmita Bhattacharyya
**ঘুড়ি** - Rajarshi Nath
**Mockingbird at Dusk** - Srujanika Roy
**GenZ Genα ও মহানায়ক** - Atis Chakrabarti
**শরতের ঠিকানা-C/O কলকাতা** - Debolina Mandal Dey
**ভারত ভাগ্যবিধাতা** - Gautam Chatterjee
**নামায়নী কথা** - Shamaly Sen Roy
**ইন্টারনেটের নাগরিক** - Shaswati Chaki
**আমেরিকার বুকে বাংলা বুক ক্লাব** - Ronita Chakraborty
**71 Dover Ln** - Arunava Saha

## Painting

Anirban Mukhopadhyay, Gargi Nandy, Sreya Das, Rumia Roy Biswas, Debolina Mandal Dey, Shaswati Chaki, Soumita Maiti, Dipankar Bose, Koyel Mukherjee, Ashmita Mukhopadhyay, Anwita Saha, Srujanika Roy, Abhraneel Das, Asmita Ghosh, Riyanshi Banik, Anwit Mandal, Dishita Ghosh, Aarush Maity

## Photography

Debasish, Dipankar

# Frames of Festivity

## **Last Year's Celebration**

Frames of Festivity

# Last Year's Celebration

# Platinum Sponsor

# পূজোর মিলনমেলা

।। শারদীয়া দুর্গাপূজা ।।

**রাইকিশোরী মিত্র**

ডেলাওয়্যার, পেন্সিলভেনিয়া, নিউ জার্সি থেকে,
সবাই আসে ছুটে ছুটে পূজোর টানে মেতে।
প্রভাত দা করেন পুজো ভক্তি ভরে মনে,
মেয়েরা নাচে, রিল বানায় হাসি-খুশির ক্ষণে।
সবাই মিলে ভাগ করে নেয় পূজোর যত কাজ,
হাসিমুখে সামলে রাখে সকাল সন্ধ্যা আজ।
বুদ্ধি বিবেচনাতে সাজে সব আয়োজন,
সকলের মিলিত চেষ্টাতেই সফল হয় মিলন।
মরীচিকার দাদারা সব ব্যস্ত ডেকোরেশনে,
পূজোর প্রাণ জাগিয়ে তোলেন নিঃশব্দ পরিশ্রমে।
ক্যামেরা হাতে ফটোদাদা ঘোরেন এদিক ওদিক,
প্রতিটি হাসি বন্দী করেন, রাখেন স্মৃতি ঠিক।
সঞ্চালিকার পরিচালনায় বাচ্চারা গান গায় নাচে,
রায়ান, জর্জ আর সঙ্গীরা দৌড়ে বেড়ায় কাছে।
এদিক ওদিক ছোটাছুটি, হাসির ফোয়ারা ছোটে,
পূজোর মাঝেই আনন্দেরা লুকোচুরি খেলে জোটে।
খিচুড়ি আর ফল মিষ্টি ভোগে ভরপুর সব থালা,
মিষ্টি দই শেষ পাতে, জমজমাট মেলা।
সিঁদুর খেলায় রাঙা হলো সবার মুখের হাসি,
চোখের জলে মাকে বিদায়, মন যে ভালোবাসি।
মলিন মুখেও হাসির রেখা, আশার আলো জ্বলে—
আসছে বছর আবার হবে, মরীচিকা পূজোর তালে।

**শুভ বিজয়া - দুর্গা মা সবার মঙ্গল করুন**

**Gouri Elo - Anirban Mukhopadhyay**

# সাতটি পরিবার থেকে আজ ২৫০ মানুষের এক বিশাল পরিবার

**নয়না ঘোষ সাহা**

(একজন সহ-প্রতিষ্ঠাতা)

২০১৬... আজ থেকে ঠিক কতগুলো বছর আগে, মাত্র সাতটি পরিবার নিয়ে যে ছোট্ট স্বপ্নের শুরু, আজ তা ২৫০-এরও বেশি মানুষের এক বিশাল, প্রাণের বাংলা পরিবার। ভাবলে সত্যিই মনটা আবেগে ভরে যায়।
সেদিন হয়তো আমরা কেউই ভাবিনি, আমাদের সেই ছোট্ট উদ্যোগ একদিন এতটা বড় হয়ে উঠবে। সাতটি পরিবার থেকে আজ আমরা ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ—একসঙ্গে হাসি, আনন্দ, উৎসব, সংস্কৃতি আর অসংখ্য স্মৃতি ভাগ করে নেওয়া একটি পরিবার।

Morichika Bengali Association আমার কাছে শুধুমাত্র একটি সংগঠনের নাম নয়। এটি আমার জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়, একটি স্বপ্নের গল্প, এবং সবচেয়ে বেশি—অসংখ্য আপন মানুষের সঙ্গে তৈরি হওয়া এক অমূল্য সম্পর্ক।

২০১৬ থেকে আজ পর্যন্ত এই পথচলায় আমি যে ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং আন্তরিকতা পেয়েছি, তার জন্য আমি হৃদয়ের গভীর থেকে কৃতজ্ঞ। এই কমিউনিটির প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পরিবার আমাদের এই পথচলাকে একটু একটু করে সমৃদ্ধ করেছে।

কখনও দুর্গাপূজার আনন্দ, কখনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কখনও একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা, আবার কখনও জীবনের কঠিন সময়ে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো—এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই আমাদের একটি সংগঠন থেকে একটি পরিবারে পরিণত করেছে।
দূরদেশে থেকেও আমরা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিকড়কে বাঁচিয়ে রেখেছি। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, আমরা খুঁজে পেয়েছি আপন মানুষ।

আজ পিছনে ফিরে তাকালে সেই প্রথম সাতটি পরিবারের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, কতটা ছোট ছিল শুরুটা, আর কতটা বড় হয়ে উঠেছে আমাদের স্বপ্ন!

এই পথচলায় আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো—আমি এমন একটি কমিউনিটির অংশ, যেখানে আনন্দ ভাগ করলে আনন্দ বাড়ে, আর কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ালে পথটা একটু সহজ হয়ে যায়।

সাতটি পরিবার থেকে ২৫০ জনেরও বেশি মানুষ—এ শুধু একটি সংখ্যা নয়। এটি ভালোবাসার একটি গল্প। বিশ্বাসের একটি গল্প। একসঙ্গে বড় হয়ে ওঠার একটি গল্প।

আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, কারণ ২০১৬ থেকে আজ পর্যন্ত আমি এমন একটি supportive community পেয়েছি, যারা প্রতিদিন আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে—দেশ থেকে দূরে থাকলেও নিজের মানুষদের থেকে দূরে থাকতে হয় না।

আজ Morichika Bengali Association-এর এই বড় হয়ে ওঠার দিনে, প্রত্যেকটি পরিবারকে, প্রত্যেকটি সদস্যকে এবং যারা কোনো না কোনোভাবে এই যাত্রায় পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রত্যেককে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সেদিন হয়তো আমরা কেউই ভাবিনি, আমাদের সেই ছোট্ট উদ্যোগ একদিন এতটা বড় হয়ে উঠবে। আজ শুধু South Jersey নয়, পুরো Tri-State area-এর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ

Morichika Bengali Association-এর সঙ্গে যুক্ত হন, আসেন, অংশ নেন এবং আমাদের এই পরিবারের অংশ হয়ে ওঠেন।

আমাদের হয়তো Bollywood বা Tollywood-এর বড় বড় তারকা নেই। আমাদের মঞ্চে হয়তো celebrity-দের ভিড় নেই। কিন্তু আমাদের আছে এমন কিছু মানুষ, যাঁরা নিজেদের ব্যস্ত জীবন থেকে সময় বের করে আসেন, নিজেদের প্রতিভা নিয়ে মঞ্চে দাঁড়ান, গান করেন, নাচেন, অভিনয় করেন, আবৃত্তি করেন—আর নিজেদের মানুষদের সামনে নিজেদের মতো করে আনন্দ ভাগ করে নেন।

আর হয়তো এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

আমাদের পথচলা যেন এভাবেই চলতে থাকে।
আমাদের পরিবার যেন আরও বড় হয়।
আর আমাদের পরবর্তী প্রজন্মও যেন ভালোবাসে বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতি এবং এই সুন্দর বন্ধনকে।

২০১৬-এর সেই সাতটি পরিবার থেকে আজকের ২৫০ জনেরও বেশি মানুষের পরিবার—
এই যাত্রার অংশ হতে পেরে আমি গর্বিত, আবেগাপ্লুত এবং সত্যিই blessed।

Morichika Bengali Association শুধু একটি সংগঠন নয়—
এটি আমাদের ঘর।
আমাদের মানুষ।
আমাদের শিকড়।
আমাদের এক টুকরো বাংলা। ❤️

# প্রবাসের মাটিতে এক টুকরো বাংলা

**শেখর সাহা**

মানুষ স্বপ্ন দেখে। সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন। থাকে সেই স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার অদম্য ইচ্ছা। অনেক বাঙালি ছেলেমেয়েরও স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার। নিজের মেধা, পরিশ্রম আর অধ্যবসায়ের জোরে ভালো চাকরি পাওয়ার। মোটা মাইনের চাকরি, সুন্দর বাড়ি, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন—সব মিলিয়ে নিজের মতো করে জীবনটাকে সাজিয়ে নেওয়ার। সেই স্বপ্নের হাত ধরেই একদিন তারা পাড়ি দেয় সুদূর আমেরিকায়। পিছনে ফেলে আসে নিজের শহর, নিজের পাড়া, বন্ধুদের আড্ডা, আত্মীয়স্বজন আর শৈশবের অজস্র স্মৃতি। ফেলে আসে বাংলার মাটি। কিন্তু মনের ভিতরে কি ফেলে আসতে পারে বাংলাকে? পারে কি ভুলে যেতে ছোটবেলার দুর্গাপুজো, নতুন জামার আনন্দ, ঢাকের আওয়াজ, পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ?

কিন্তু বিদেশের মাটিতে পৌঁছে কি সবাই নিজের শিকড়ের কথা ভুলে যায়? জীবনের ব্যস্ততা, কাজের চাপ আর সংসারের হাজারো দায়িত্বের মধ্যে কি হারিয়ে যায় ছোটবেলার সেই চেনা দিনগুলো? হারিয়ে যায় কি পাড়ার দুর্গাপুজো, পুজোর নতুন জামা, ঢাকের আওয়াজ, কাশফুলে ভরা মাঠ কিংবা শীতের সকালে মায়ের হাতের গরম পিঠের স্বাদ? না, সবার ক্ষেত্রে তা হয় না। কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা হাজার মাইল দূরে থেকেও বুকের গভীরে আগলে রাখেন নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি আর নিজের মানুষকে।

তাঁদের কাছে বাঙালিয়ানা শুধু উৎসবের আনন্দ নয়। বাঙালিয়ানা তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতি। তাঁদের জীবনবোধ। তাঁদের ভালোবাসা। নিউ জার্সির বাঙালি পরিবারগুলির মধ্যে এমনই কয়েকজনের কথা বলতে হয়। অরুণাভ, রাজীব, শুভেন্দু, দীপঙ্কর, পার্থ, দেবাশিস, পার্থসারথি, জয়ন্ত, পূর্ণেন্দু, সুপ্রতীম, নয়না, দেবযানী, শাশ্বতী, পারমিতা, সৌমিতা  এবং আরও অনেকে। প্রত্যেকের জীবনের গল্প আলাদা। কারও শৈশব কেটেছে উত্তরবঙ্গে, কারও কলকাতায়, আবার কারও অন্য কোনও শহরে। কেউ হয়তো ছোটবেলা থেকেই বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। কেউ আবার জীবনের নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছেছেন আমেরিকায়।প্রায় এক দশক ধরে আমেরিকার নিউ জার্সির বিভিন্ন শহরে তাঁদের বসবাস। চাকরি, সংসার, সন্তানদের পড়াশোনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা পরিকল্পনা—সব মিলিয়ে ব্যস্ত জীবন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজের ব্যস্ততা। সপ্তাহের শেষে সংসারের নানা দায়িত্ব। তবু এই ব্যস্ততার মধ্যেই তাঁরা খুঁজে নিয়েছেন নিজেদের জন্য একটু সময়। খুঁজে নিয়েছেন এক টুকরো বাংলা।
সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম মরীচিকা নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের। নামটি শুনলেই মনে হয়, যেন দূরের কোনও স্বপ্ন। কিন্তু মরীচিকা শুধু স্বপ্ন দেখেনি। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। প্রবাসের মাটিতে গড়ে তুলেছে এক সুন্দর বাঙালি পরিবার। যে পরিবারের সদস্যরা শুধু উৎসবের আনন্দে একসঙ্গে হন না, একে অপরের সুখ-দুঃখেরও সঙ্গী হয়ে ওঠেন। বিদেশের মাটিতে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণকে আপন করে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তার জন্য দরকার সময়, পরিশ্রম, অর্থ এবং সর্বোপরি আন্তরিকতা। মরীচিকার সদস্যরা সেই আন্তরিকতা নিয়েই এগিয়ে চলেছেন। পয়লা বৈশাখ এলেই যেন তাঁদের মনে পড়ে যায় বাংলার নববর্ষের কথা। নতুন জামা, মিষ্টিমুখ, শুভেচ্ছা বিনিময় আর প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠা। সরস্বতীপুজোয় মনে পড়ে যায় স্কুল-কলেজের সেই দিনগুলি। আর দুর্গাপুজো? সে তো বাঙালির প্রাণের উৎসব। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কত আবেগ, কত স্মৃতি, কত ভালোবাসা!

নিউ জার্সির মাটিতে দুর্গাপুজোর আয়োজন করতে গিয়ে তাঁরা যেন আবার ফিরে পান নিজেদের ছোটবেলাকে। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয় প্রস্তুতি। কে কী করবেন, কীভাবে অনুষ্ঠান হবে, কোথায় কী আয়োজন করা যায়—এসব নিয়ে চলে আলোচনা। কেউ ব্যস্ত থাকেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিতে। কেউ সাজসজ্জার কাজে। কেউ আবার খাবারদাবার ও অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব সামলান।

এই আয়োজনের পিছনে থাকে অনেক পরিশ্রম। থাকে ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সময় বের করার চেষ্টা। থাকে নিজের সংসারের কাজ সামলে সংগঠনের জন্য ছুটে আসা। তবু কারও কোনও অভিযোগ নেই। কারণ, এই কাজের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পান এক অন্যরকম আনন্দ। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে তাঁদের মিলন যেন এক পারিবারিক উৎসবে পরিণত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নতুন পোশাক পরে আনন্দে ছুটে বেড়ায়। বড়রা একে অপরের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠেন। কেউ বহুদিনের পুরোনো বন্ধুকে ফিরে পান। কেউ নতুন বন্ধু তৈরি করেন। আবার কেউ হয়তো বহুদিন পর পরিচিত কোনও মুখ দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। পুজোর মণ্ডপে যখন ঢাকের আওয়াজ ওঠে, তখন হয়তো কারও চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিজের গ্রামের পুজো। মনে পড়ে যায় বাড়ির উঠোন, পাড়ার মণ্ডপ কিংবা মায়ের সঙ্গে অঞ্জলি দেওয়ার স্মৃতি। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও তখন মনে হয়, যেন বাংলাতেই রয়েছেন। এই অনুভূতিটুকুই মরীচিকার আসল শক্তি।
তবে মরীচিকার কর্মকাণ্ড শুধু উৎসবের আনন্দে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের ভাবনার পরিধি আরও অনেক বড়। নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি তাঁরা চান, আগামী প্রজন্মও যেন বাংলা ভাষা ও বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। আজকের প্রবাসী শিশুদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা আমেরিকায়। তাদের স্কুল, বন্ধু, খেলাধুলা, দৈনন্দিন জীবন—সবই বিদেশের পরিবেশে। তাদের কাছে দুর্গাপুজো হয়তো প্রথমে আর পাঁচটা উৎসবের মতোই। কিন্তু মরীচিকার মতো সংগঠনের উদ্যোগে তারা ধীরে ধীরে জানতে পারে বাঙালির উৎসবের ইতিহাস। পরিচিত হয় বাংলা গান, নাচ, কবিতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। বাবা-মায়ের শৈশবের গল্প শুনতে শুনতে তাদের মনেও জন্ম নেয় বাংলার প্রতি ভালোবাসা। এভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বেঁচে থাকে সংস্কৃতি। বেঁচে থাকে শিকড়ের টান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মরীচিকার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আরও অনেক বাঙালি পরিবার। তাঁদের অংশগ্রহণে এই সংগঠন ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে এক সুন্দর সামাজিক পরিসর। এখানে কেউ একা নন। উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি বিপদে-আপদেও একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরি হয়েছে।
কিন্তু এই গল্পের সবচেয়ে আবেগঘন অধ্যায়টি রয়েছে নিউ জার্সি থেকে বহু দূরে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ির অদূরে গুলমা চা-বাগানের নিচেবাসা গ্রামে। সেখানে রয়েছে এক অন্য পৃথিবী। সবুজ চা-বাগানের মাঝে ছোট ছোট ঘর। প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকা অসংখ্য পরিবার। তাঁদের সন্তানদের চোখেও রয়েছে অনেক স্বপ্ন। কেউ পড়াশোনা করে বড় হতে চায়। কেউ শিক্ষক হতে চায়। কেউ আবার নিজের পরিবারের দুঃখ-কষ্ট দূর করার স্বপ্ন

দেখে। কিন্তু সব স্বপ্ন পূরণের পথ সমান সহজ নয়। অভাবের সংসারে অনেক সময় শিশুদের পড়াশোনার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। অনেক কিশোরী ও মহিলার জীবনেও রয়েছে নানা বাধা। তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রয়োজন একটু সহায়তা, একটু উৎসাহ, একটু ভালোবাসা। আর ঠিক সেই জায়গাতেই এগিয়ে এসেছে মরীচিকা। নিউ জার্সির ব্যস্ত জীবনে নিজেদের নানা দায়িত্ব সামলেও তাঁরা ভুলে যাননি নিচেবাসার শিশুদের কথা। বছরের পর বছর ধরে তাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রামের লার্নিং সেন্টারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শিশুদের পড়াশোনা ও বিকাশের জন্য সহযোগিতা করেছেন। পিছিয়ে পড়া কিশোরী ও মহিলাদের কথাও তাঁদের ভাবনায় রয়েছে। ভাবতে ভালো লাগে, বিদেশের কোনও এক শহরে বসে কয়েকজন বাঙালি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন নিচেবাসার শিশুদের কথা। কীভাবে তাদের পাশে দাঁড়ানো যায়, কীভাবে তাদের মুখে একটু হাসি ফোটানো যায়, কীভাবে তাদের ভবিষ্যতের পথে সামান্য হলেও সাহায্য করা যায়।

আসলে নিজের পরিবারকে ভালোবাসা খুব স্বাভাবিক। নিজের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দেওয়াও প্রত্যেক মা-বাবার স্বপ্ন। কিন্তু সেই ভালোবাসার পরিধি যখন নিজের পরিবারের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যের সন্তানদের কাছেও পৌঁছে যায়, তখনই তা হয়ে ওঠে আরও মহৎ। মরীচিকার সদস্যদের জীবনেও সেই ভালোবাসারই প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁরা নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিদেশের মাটিতে নিজেদের পরিচয় তৈরি করেছেন। কিন্তু সেই সাফল্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সামাজিক দায়িত্বের এক সুন্দর অধ্যায়। তাঁদের এই কাজ হয়তো সংবাদপত্রের বড় বড় শিরোনাম হবে না। হয়তো তাঁদের নাম নিয়ে বড় কোনও আলোচনা হবে না। কিন্তু নিচেবাসার কোনও শিশুর জীবনে তাঁরা যে সামান্য পরিবর্তন আনতে পারছেন, সেটাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হতে পারে। কোনও শিশুর পড়াশোনার সুযোগ তৈরি হলে, কোনও কিশোরী নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখলে কিংবা কোনও অসহায় পরিবারের মুখে হাসি ফুটলে সেই আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মরীচিকার প্রতিটি সদস্যের ভালোবাসা। এই ভালোবাসার গল্পে কোনও বড় বড় কথা নেই। নেই আত্মপ্রচারের আড়ম্বর। আছে শুধু কিছু মানুষের আন্তরিক ইচ্ছা। আছে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা।
প্রবাসের মাটিতে মরীচিকা তাই শুধুই একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন নয়। এটি একদল মানুষের মিলনমেলা। এক টুকরো বাংলা। এক টুকরো ভালোবাসার সংসার। এখানে দুর্গাপুজোর ঢাকের

আওয়াজে জেগে ওঠে বাংলার স্মৃতি। বাংলা গানের সুরে ফিরে আসে শৈশব। বন্ধুদের আড্ডায় মুছে যায় বিদেশের একাকিত্ব। আর সেই আনন্দের মধ্যেই জায়গা করে নেয় নিচেবাসার শিশুদের মুখ। নিউ জার্সির ব্যস্ত জীবনের মাঝেও যাঁরা বাংলার উৎসবকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিচ্ছেন বাঙালির সংস্কৃতি, আবার সেই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামের শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করছেন, তাঁদের এই পথচলা নিঃসন্দেহে এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। বাংলা তাঁদের কাছে শুধু জন্মভূমি নয়। বাংলা তাঁদের হৃদয়ের ঠিকানা। আর নিচেবাসার শিশুরা যেন সেই ঠিকানারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।এই বন্ধন অটুট থাকুক। মরীচিকার হাত ধরে প্রবাসের বাঙালিয়ানা আরও সমৃদ্ধ হোক। আর সেই ভালোবাসার আলো পৌঁছে যাক বাংলার আরও অনেক ঘরে, আরও অনেক শিশুর জীবনে ।

# Remembrance: A Brief History of Women and Spirituality

**Dr. Ritobrita Chakraborty**

History, as we most commonly receive it, is a story told by those who survived to write it, and in most civilizations, those survivors were men of institutional power. Yet beneath the surface of patriarchal religious norm, in the crevices of ancient hymns, philosophical dialogues, and temple inscriptions, there persists another story: one of women who stood before gods and fire, who debated the nature of the Self and the cosmos, who initiated ritual, composed scripture and hymns, and led communities of spiritual seekers. These women were not outliers. They were, in many cultures around the world and across vast stretches of time, a natural and revered part of the spiritual landscape. The Vedic tradition of ancient India offers perhaps the richest and most philosophically nuanced record of female spiritual authority in the ancient world, and it is from there that my essay begins.

It is autumn in Philadelphia, 2024, and a strange silence falls over the Durga Puja hall just before the first Sanskrit verse is spoken. Conversation fades, children stop weaving between folding chairs, incense settles over the smell of freshly-cut marigolds and chrysanthemums, and several hundred eyes turn toward Her: ten-armed, mounted on a lion, serene and fierce in the same breath. In that silence, before mantra turns Mrinmayi into Chinmayi: clay into consciousness, I step forward as the officiating purohita. What I have learned, standing there for the Bengali diaspora community I serve, is that the novelty most people register in that moment is rarely the Sanskrit itself, carried to

unaccustomed earth eight thousand miles from the Shaktipeeth of Birbhum. It is the person reciting it. I have come to expect the small intake of breath, the glance passed between people, and the question asked afterward with careful politeness, as though the word required checking twice before it could be trusted to hold a woman's weight: *So, you're the priest? Where did you learn all the rituals?*

I did not arrive at the altar by accident, and I did not arrive there alone, even though every ancestor I can name who stood at this particular altar before me was a man. My family has practiced as purohits in Birbhum for generations, a Sanskrit gurukul lineage running back further than anyone in it thought to write down, on the reasonable assumption that some things simply continue. I grew up inside that continuity without being its heir, in the way a daughter often watches a threshold from just outside it. What I did inherit, because no one thought to withhold it, was the cadence of the mantras, the logic of the rites, the sense that ritual is not decoration laid over belief but the very mechanism by which the sacred becomes perceptible, Mrinmayi turning into Chinmayi. When I finally stood before Maa Durga myself as officiant, what surprised me was not the difficulty of the Sanskrit or the sequence of gestures no handbook fully captures. It was learning that everything I needed had already been given to me; nothing about it had ever actually required a man to carry it. The absence of women at that altar, I came to understand, was not a rule written into the rite. It was a habit mistaken, over centuries, for a rule.

That confusion has a precise etymology, which I find useful the way I find any precise thing useful; I trained as a scientist before I trained as a priest, and I have never been able to fully separate the two disciplines of attention. Purohit, from puras, means ‘forward,’ and hita, means ‘placed,’ simply translates to "the one appointed foremost." Sanskrit's own stri-pratyay grammar produces a feminine form, purohita, as easily as it produces any other feminine noun; nothing in the word itself excludes a woman from holding it. And yet history rarely gave her the title, offering instead the smaller, male-tethered roles of hotri or yajika, reciter, or the sacrificer's assistant, always in relation to a man's office, rather than possessing one of her own. In my laboratory, where I study disorders of the human brain, I have learned that a result is only as trustworthy as the moment someone goes back and checks it against the original data, rather than against what everyone has assumed the data must say. At the altar, I have learned that a tradition survives the same way. So, when someone treats my presence there as a deviation, I find the more interesting question is not whether I belong, but where the

assumption that I don't came from, and the honest answer is that it came from history, not from revelation.

Because when I go back to the earliest layer of the tradition I love, I do not find myself standing alone; I find myself standing at the end of an unbroken and much larger line, one that runs well past the borders of India. In the Brihadaranyaka Upanishad, **Gargi Vachaknavi** presses the sage Yajnavalkya on the nature of ultimate reality until he warns her not to ask further than language can bear, a woman's philosophical audacity preserved, not censored, by the text itself. **Maitreyi**, Yajnavalkya's wife, chooses spiritual knowledge over half his fortune at the time of his sanyas. The Rig Ved names some two dozen women as *rishikas*, seers composing revelation in their own right: **Lopamudra** on discipline within the body, **Apala Atreyi** praying for healing with startling intimacy, **Ghosha Kakshivati** moving from cosmic hymn to raw human longing, **Vishvavara Atreyi** tending the homagni, the sacrificial fire, herself as ritvika, or officiant.

None of this reads to me as symbolic inclusion. It reads as ordinary fact, later inconvenienced by history. And when I widen the lens past my own tradition, the same shape appears again and again, in places that never read the Vedas and owe them nothing. **Enheduanna**, daughter of Sargon of Akkad, served as en-priestess of the moon god at Ur more than four thousand years ago and is the first author in world literature whose name we know. Egypt's God's **Wives of Amun** held land and ritual authority to rival the male high priesthood of Thebes, passing the office from woman to woman by adoption rather than marriage. In the Sippar of Old Babylon, cloistered naditu women ran temple business under vows of celibacy two millennia before a Christian nun took the same vow. Aztec cihuacuacuilli priestesses tended the temples of Toci and Xochiquetzal and trained girls in ritual, inside a cosmology that organized gender by complementarity rather than equality but still made room for a woman's hand on the rite. Delphi's **Pythia** was the actual mouth through which a god was understood to speak, however much the men around her insisted on doing the interpreting. Rome trusted its sacred fire to Vestal Virgins and punished its neglect as a capital offense, proof, if a grim one, of how seriously the office was taken. The Norse völva practiced seior as a female specialization so complete that a man who took it up risked the charge of ergi, unmanliness. The Hebrew Bible gives us **Deborah**, who judged and led armies, and **Huldah**, whose verdict on a newly found Torah scroll was sought over any man's in the

room.  Centuries later, **Hildegard** of **Bingen** governed an abbey, corresponded with popes, and produced  theology on her own authority without a single ordination behind her; **Catherine** of **Siena** advised  popes directly and is now numbered among the Church's Doctors; in Basra, **Rabia al-Adawiyya**  shaped the whole subsequent grammar of divine love within Sufi Islam, without any priesthood  existing in that tradition to admit or exclude her from. I did not learn most of these names from  my own family's texts. I have gathered them the way I gather citations for a paper, because a  single data point can always be dismissed as an anomaly, and enough of them together stop being  deniable.

What that gathering has taught me is that the exclusion I sometimes meet at the door of a puja  hall is not a Vedic inheritance at all; it is the residue of a much later, much more specific historical  process, and knowing its date matters. Texts like the Manusmriti and other Dharmashstras  compiled in the post-Vedic period, had already begun treating a woman's marriage as  categorically superior to her independent spiritual discipline. By the Gupta era, as priestly office  consolidated within hereditary, Sanskrit-literate lineages, the older path of the brahmavadini: a  girl formally initiated into Vedic study, who underwent upanayan and kept her own sacrificial fire,  had quietly disappeared from orthodox practice. Menstruation, pregnancy and childbirth,  intimately bound to the very generative power the Goddess herself embodies, were recoded as  impurity rather than potency, a recoding my own Shakta lineage never fully accepted, since at  **Kamakhya** in Assam the Goddess is worshipped in her menstruating form during Ambubachi,  treating what other traditions call impurity as Shakti itself.

The later layers of restriction belong to the post-Vedic era Smriti, in which laws were made to  adapt principle to the particular social and geopolitical turmoil of the late Vedic period, and not  to the early Vedic era's Shruti, which includes the revealed Vedas and Upanishads that Sanatan  Dharm's theology holds as authoritative because they were revealed or heard, not legislated. If  the Self the Upanishads describe is genderless awareness or sat-chit-anand before it is anything  else, then a rule barring a woman from the altar cannot be older or truer than the text that says  3  gender belongs to appearance or maya rather than essence. This is not a rhetorical move I  invented to make my own position more comfortable. It is the same method **Raja Rammohan  Roy** used against sati, and **Ishwar Chandra Vidyasagar** for widow remarriage, during the Bengal  Renaissance: go back to the earliest text and let it, rather than the intervening

centuries, have the final word. I did not choose that method because I am a scientist. I suspect I chose science, in part, because I had already absorbed that method at home.

Locked out of formal ritual office, the women who came before me in this tradition did not disappear; their authority simply moved to where the door was still open. **Andal** composed her devotional poetry in Tamil rather than Sanskrit, and it is still recited in South Indian Vaishnava temples through Dhanurmasam each winter. **Akka Mahadevi** walked away from marriage to become a wandering Shaivite mystic in Karnataka, answering a challenge to her spiritual legitimacy by insisting that at the deepest level of consciousness there is no gender left to disqualify anyone. **Janabai** turned the drudgery of domestic service into abhangs; **Mirabai** set devotion to Krishna above every royal and patriarchal claim on her; **Lal Ded's** Kashmiri vakhs, or verses, have been sung by Hindus and Muslims together for nearly seven hundred years. Closer to my own moment, **Sri Ramakrishna's** worship of Kali as Mother, at a temple in Dakshineswar, that was built famously by the pious champion of the Bengal renaissance, **Rani Rashmoni**, made motherhood itself a lens onto ultimate reality. His wife **Sarada Devi went** on to initiate monks and guide thousands, holding real spiritual authority in a society that would not yet grant her a formal title for it. I think about her often, because I recognize the shape of her position, spiritual authority that the community trusted completely in practice while still hesitating, on paper, to name it. I am fortunate to stand somewhere past that hesitation, though not entirely past it; the questions I get after a puja, whether I consider myself a "feminist priest," as though the point of standing there were protest rather than continuity, tell me the paper is still catching up to the practice.

I don't take the label, when it's offered, because it flattens something that feels less like activism and more like inheritance finally collected in full. I am part of a genuinely new wave doing this work in the open: **Jnana Prabodhini** in Maharashtra has trained more than eight hundred women as purohitas since 1992, over a hundred of them full-time now; the **Shankar Seva Samiti** in Ahmednagar has trained roughly ten thousand women priests over twenty-five years; temples in Kerala are opening rites to women that were closed a generation ago; in Bengal, priestesses such as **Dr. Nandini Bhowmik** are doing openly what custom had quietly forbidden, and daughters are learning Chandipath alongside sons.

The Bengali diaspora, strangely, has been an accelerant rather than an obstacle. Eight

thousand miles from India, away from any hereditary lineage, a community in Philadelphia cannot afford to ask whether a woman is permitted to lead a rite; it can only ask who has actually learned the rituals, who can hold the sequence and the Sanskrit and the steadfastness for two full days in 4 front of the Goddess. Competence answers a question that custom used to answer instead, and increasingly nobody in the room misses the custom. For many of the families I serve as purohita, a woman officiating a Satyanarayan puja, a grihapravesh, or a Saraswati puja no longer registers as remarkable at all. After all, the Goddess herself has crossed oceans with them.

Even now, in traditions far from mine, the argument over women's participation as spiritual officiants is still unresolved rather than settled: the Vatican's own commission on women deacons reported a divided, largely negative judgment as recently as December 2025, while the Church of England confirmed its first woman Archbishop of Canterbury. Two decisions, moving in opposite directions, inside the same broad question I have been asking of my own tradition. That tells me something I try to hold onto whenever a stranger's skepticism reaches me mid-ritual: this is not a question my community invented, and it is not one I will finish resolving either. It is simply the question currently reaching my generation, the way it reached Gargi's, and Sarada Devi's, and will reach whoever stands where I am standing a hundred years from now.

Every autumn, after days of worship, the Goddess returns to Kailash, and the women around me smear vermilion on each other's faces and say, together, asche bochhor abar hobe, next year, She will come again. It is an act of trust dressed as a farewell: She leaves because everyone in that room already knows She is coming back. I have come to think traditions survive on the same trust, obscured by habit and by history for a while, alive at the root the entire time, and returning not as invention but as remembrance. When I stand before Maa Durga now, I no longer feel like an exception or an outlier. I feel like someone arriving home a little later than she should have, walking a path that was, it turns out, always there, made long ago by women whose names I only had to go back far enough to find.

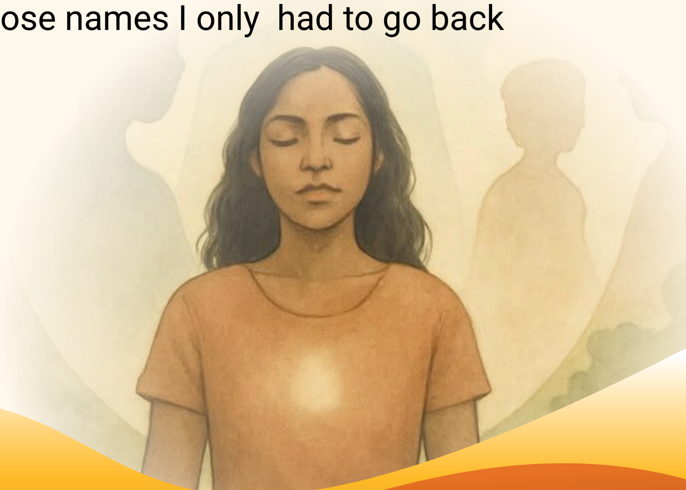

# Puja & Plates

**Mishika Ghosh(9th grade)**
**Voorhees, New Jersey**

Bengali culture is known for its colorful festivals, rich traditions, and strong sense of family. It has a long history of art, music, literature, and delicious food that has been passed down through generations. Although there are many things are unique in Bengali culture , food is one of the most important. It brings people together, helps keep traditions alive, and is a big part of every celebration. Whether it is a regular family dinner or a major festival, having food is something every Bengali looks forward to.

One of the biggest Bengali festivals is Durga Puja. This five-day festival honors Goddess Durga and celebrates the victory of good over evil. During Durga Puja, families visit beautifully decorated pandals, pray together, and enjoy spending time with friends and relatives. Many people wear new traditional clothes, dance to beats of the dhak, and take part in Anjali by offering flowers and prayers to Durga. For many Bengalis, Durga Puja is the most anticipated time of the year because it is a chance to celebrate traditions, spend time with family, and most importantly enjoy good food. Food is one of the highlights of Durga Puja. One of the most important meals is Bhog, which is first offered to Goddess Durga before being shared with everyone.
Bhog usually includes khichuri, labra, and a sweet tomato or mango chutney. Other popular dishes include luchi with aloo dum, which is a soft fried bread served with a flavorful potato curry. Fish is also a favorite in Bengali cuisine, especially dishes like Shorshe Ilish, Chingri Malai Curry, and Macher Kalia.

Along with all the non-vegetarian foods , there are also popular vegetarian items like Mocha (banana flower), Dhokar Dalna, and Shukto. Even with all the vegetarian options that Bengalis have, during Durga Puja, Bengalis tend to lean more towards non-veg options like Kosha Manghsho (goat curry). No Bengali meal is complete without mishti, or sweets, such as rosogolla, sandesh, and mishti doi. Food is a big part of what makes Durga Puja so special and gives families something to look forward to every year.

Another important part of Bengali food is the use of spices. Bengali spices like panch phoron, turmeric, poppy seeds, radhuni, and gorom moshla are commonly used when preparing meals. These spices are an important part of Bengali cooking because they give each dish its own unique taste that Bengali food is known for. No matter what dish is being made, these spices help give the food its familiar taste.

Ultimately, Bengali food is much more than just something to eat. It is a way for families to come together to celebrate important traditions. From Bhog during Durga Puja to flavorful fish, comforting vegetarian dishes, delicious sweets, and the spices that bring everything together, food represents an important part of Bengali identity. It connects people to their culture and reminds them of home. This is what makes Bengali food, and Bengali culture as a whole, so special and unique.

# ঘুড়ি

**রাজর্ষি নাথ**
কলকাতা

আকাশের নীলিমাকে পেছনে ফেলে
হাওয়ার তালে তাল ঠুকে
শহরের ঘিঞ্জি বাড়িগুলো পেরিয়ে
স্বার্থপর মানুষদের কোলাহল এড়িয়ে
পরম নিশ্চিন্তে দিগ্বিদিকশূন্য
একটা ঘুড়ি -
নেমে আসছে মাটিতে।

সে ঠিক জানে
কোন তরুণ তাজা হাত
তাকে আনন্দে লুফে নেবে
আর নেচে নেচে বলবে -
'আমি পেয়েছি আমি পেয়েছি'!

নতুন স্পর্শে ঘুড়িও বলবে -
'আমি পেয়েছি আমি পেয়েছি'!

তারপর?
তারপর
আবার লাটাই
আবার আকাশ আবার খেলা।
আবার কত নাম -
পেটকাঠি, মোমবাতি, বগগা, চাঁদিয়াল!

জীবনের ময়দান।
খেলা আজো সেভাবেই চলছে।।

# ছোট্ট কুঁড়ি

**বিস্মিতা ভট্টাচার্য**
পেন্সিলভেনিয়া

ছোট্ট কুঁড়ি ফুটে ওঠা সদ্যোজাত রঙিন ফুল
দেখল পৃথিবীটাকে, প্রথমবার ~
তার প্রথম দৃষ্টিশক্তি দিয়ে
কিছু বুঝলো না, হয়তো -
তবে এইটুকু বুঝল সে, যে এই পৃথিবীর নতুন
সদস্য 'সে',
'সে' বুঝলো -
মৌমাছি, বোলতা, পাখিদের কলকাকলি,
তারই তালে তালে সে মেলে দিল ছোট্ট পাগড়ি।
এই ভাবেই ক্রমাগত পরিচর্যায় বেড়ে উঠলো 'সে',
একদিন পেল যৌবন এক রঙিন স্পর্শে।
সময়ের সাথে সাথে হয়ে উঠল পরিপূর্ণ,
ঘাত প্রতিঘাতে সে হলো না দুর্বল বিবর্ণ;
প্রশংসা কুৎসা ঈর্ষা সমালোচনায় রইল অক্ষুন্য,
বিনা কণ্ঠগোচরে অসীম সৌন্দর্যের সৃষ্টিশীলতায়
রইল নিমগ্ন।

# Mockingbird at Dusk

**Srujanika Roy(11 years)**

The whispering songbird sings of joy,

Flying through the skies of blue.

In the morning's dawn of vivid light,

they sing the melodies like a tune...

In the summer's moonlit sky,

they whistle like a flute.

Humming as they sleep and snore,

They cry and hoot as the rain washes shore.

They rock the baby in the tree,

and sing their final melodies.

Goodbye today, tomorrow, and next week.

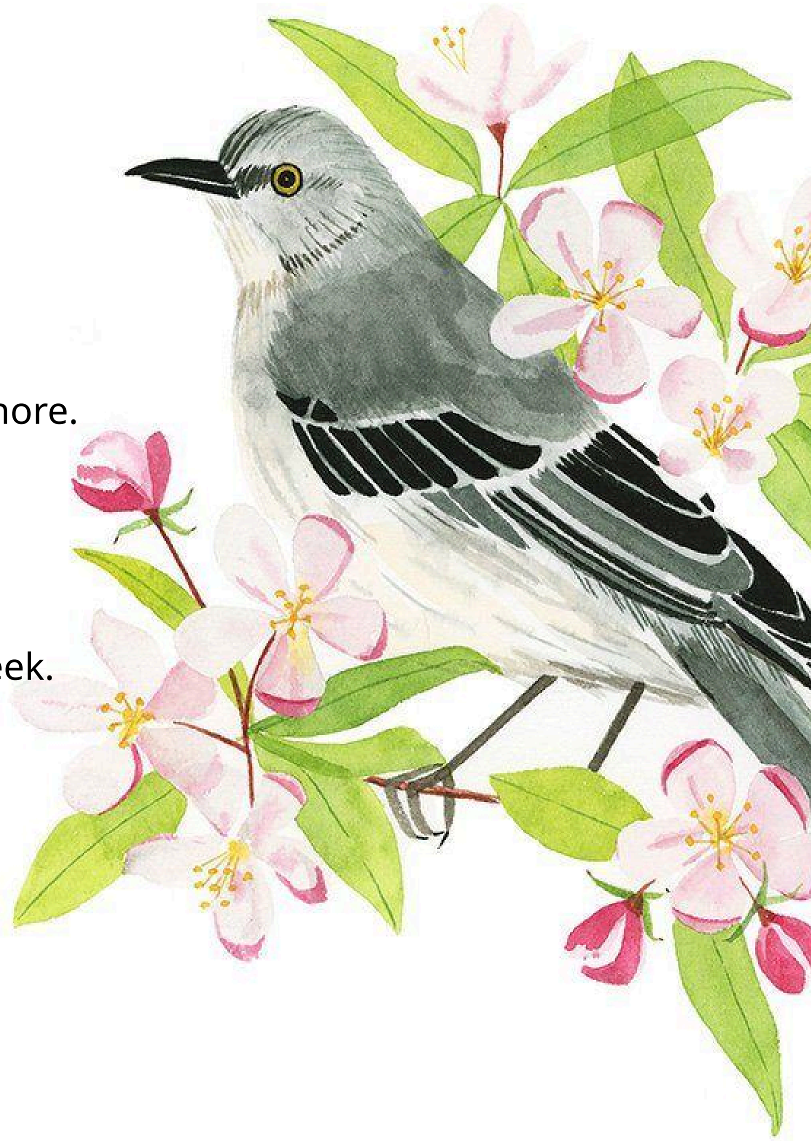

## Gold Sponsor

# Gold Sponsor

# Gold Sponsor

# Center for Asian Health

**Lewis Katz School of Medicine, Temple University**

## Mission

The Center for Asian Health (CAH) advances health and well-being through rigorous, culturally informed research, interdisciplinary collaboration, and community engagement, addressing the needs of Asian American populations and broader under-resourced communities. CAH drives innovation in population and clinical health while training the next generation of health scholars, professionals and leaders.

## Vision

The Center for Asian Health (CAH) advances health and well-being through rigorous, culturally informed research, interdisciplinary collaboration, and community engagement, addressing the needs of Asian American populations and broader under-resourced communities. CAH drives innovation in population and clinical health while training the next generation of health scholars, professionals and leaders.

## Contacts

**Grace X. Ma, PhD (Funding Director):** grace.ma@temple.edu

**Aisha Bhimla, PhD:** aisha.bhimla@temple.edu

Temple University
Lewis Katz School of Medicine | Center for Asian Health

# GenZ Genα ও মহানায়ক

**অতীশ চক্রবর্তী**
ফিলাডেলফিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আমি পাতি বাংলা বিদ্যালয়ে পড়ছি বলে **Z** কে বরাবর জেড বলে এসেছি। পরে ইঙ্গবঙ্গ-রা যখন আমার বন্ধু হল, তখন তারা আমাকে কিছুটা হ্যাটা করে বলত, আরে এখন আর কেউ জেড বলে না - বলে জি - উচ্চারণটা অবশ্য জেড এর **Z** এর মত। তবে সেটাও আমার মত বাংলা মিডিয়ায় পড়া ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে যে সহজ ছিল তাই-ই বা বলি কি করে - জিভের অনেক কসরত করে করে তবে রস্ত করতে পেরেছি - জি আর **Z** উচ্চারণটা। এখন তো দেখি বাংলাতে বাংলা-ই ব্রাত্য, তিন বছরের শিশু যে সব পাড়ার প্লে-স্কুলে ভর্তি হচ্ছে, সেখানে ইংরাজি দিয়েই তাদের শিক্ষা শুরু। মাতৃভাষা-ই মাতৃদুগ্ধ বলে এখন আর কেউ মনে করে না। সে যাইহোক আমি এই ভেতো বাঙলী যখন পোস্ট-ডক্টরাল বৃত্তি পেয়ে আমেরিকার ফিলাডেলফিয়াতে এসে পড়লাম, তখন দেখি সত্যি তো, সকলে এখানে **Z**-ই বলে, জেড কেউ কয় না। আমি জানি না এখন দেশে কি শেখানো হয়।

এদেশে এসে দেখলাম যে এখানে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে নানাভাবে ভাগ করা হয়েছে। দেশে থাকতে এতগুলো প্রজন্মের নাম-ই জানতাম না। আমার যে নিশ্চিত জন্ম হয়েছে সেটুকু আমি জানতাম বটে, কিন্তু আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করত যে তুমি কোন প্রজন্মের তা বল - আমি বলতে পারতাম না। আসুন সংক্ষেপে আমি এইসব প্রজন্মদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। নীরব প্রজন্ম **(Silent Generation)** বলে বিবেচিতরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিশু হিসেবে বেঁচে ছিল অথবা তার কিছুদিন পরেই তারা জন্মগ্রহণ করেছিল। এদের জন্ম(১৯২৮-১৯৪৫) এই সময়ের মধ্যে। **Baby Boomers** এর বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে জানি না। এরা সব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ- পরবর্তী সময়ে (১৯৪৬-১৯৬৪) জন্মছিল এবং তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবার গতিপথে নানান বড় বড় সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। Generation X হল গিয়ে ১৯৬৫ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া একটি প্রজন্ম। এরা অনেক বেশি স্বাধীনচেতা। ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির উত্থানের সময় এরা বেড়ে ওঠে। **Millennials(Gen Y)** জন্মছে ১৯৮১ থেকে ১৯৯৬ সালের মধ্যবর্তী সময়। এরাই প্রথম

ডিজিটাল বিপ্লব দেখেছে, টুইন টাওয়ার আক্রমণ, যা নাইন ইলেভেন ৯/১১ নামে পরিচিত তা দেখেছে এবং এই প্রজন্ম ২০০৮ সালের ভয়াবহ আর্থিক সংকটের সম্মুখীনও হয়েছে। এর পরে হল গিয়ে **Generation Z** বা সংক্ষেপে **Gen-Z** (১৯৯৭-২০১২) - এই জেনারেশন জেড বা জি যাই বলুন না কেন, এরা হল আরও উন্নততর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে নিমজ্জিত একটা প্রজন্ম। স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া যেমন টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ইউটিউব, ফেসবুক সহ নানান ভার্চুয়াল মাধ্যমে গলা অবধি ডুবে আছে। এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে যখন আইফোনে ডুবে থাকে তখন এদের ফেসবুকের **f** এর মতই দেখায়। তবে মনে রাখতে হবে এরা কিন্তু কোভিড-১৯ এর জন্য অনেক ভুগেছে। ২০১৩-২০২৫, এর মধ্যে যারা জন্মেছে তারা হল **Generation Alpha** সংক্ষেপে **Gen**α এবং এরা সকলেই একেবারে একবিংশ শতাব্দীতে জন্মেছে। এরাই প্রথম প্রজন্ম, যারা এআই, স্মার্ট প্রযুক্তির আরও উন্নততর রূপ ভোগ করছে। মজা করে আমি আমার ছেলেকে বলি, তোর ছেলে বা মেয়েরাও **MIT** তে পড়তে চাইবে, তবে সেই **MIT** হবে **Mars Institute of Technology** !!!! সমস্যা আরও বাড়বে, কারণ নিজ কক্ষপথে মঙ্গলের অবস্থান পৃথিবী থেকে কত দূরে তাঁর ওপর নির্ভর করবে একবার হেলো বললে কতক্ষণ পড়ে আমি শুনতে পাব। এই সময়টা ৩ মিনিট থেকে ২২ মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। খুব মজা হবে, কারণ হেলো বলে ২২ মিনিটের মধ্যে কিছু কাজ করে নেবার সময় পাব। কারণ এ কথা হলফ করে বলতে পারি, আমাদের পরের প্রজন্ম না হলেও তার পরের প্রজন্ম মনে করবে, কবি সুকান্ত যতই বলে থাকুন, “তবু আজ যতক্ষণ দেহ আছে প্রাণ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি— নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার” - এতদিনে যখন এ পৃথিবী বাসযোগ্য করা যায়নি তাহলে আর কোনও দিন যাবে না, পাড়ি জমাতে হবে, ভিন গ্রহে!! আর মঙ্গল গ্রহের থেকে মঙ্গলকর যাত্রা আর কি-ইবা হবে? সে যাইহোক আমার শিরোনামে ফিরে আসি।

উত্তম কুমার জন্মছিলেন ১৯২৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। মানে উনি জন্মছিলেন নীরব প্রজন্ম (**Silent Generation**) - এ। এই মুহূর্তে যে প্রজন্ম চলছে তারা মহানায়ক উত্তমকুমারের থেকে পাঁচ (৫) প্রজন্ম দূরে। দূরত্ব অনেক - বিশেষ করে যখন আধুনিক দ্রুত প্রগতিশীল যুগে বছর থেকে বছরের এই দূরত্ব অতি দ্রুত গতিতে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আমার মনে হল নীরব প্রজন্মের (**Silent Generation**) মহানায়ক উত্তমকুমারকে কি নিয়ে বর্তমান **Generation Alpha**-র ছেলেরা কি আদৌ কিছু ভাবে? বা তার ঠিক আগের প্রজন্ম, পশ্চিমবঙ্গের GenZ-ও কি এখনও উত্তম কুমারকে নিয়ে চিন্তিত? মনে হয় কিছু **GenZ** ব্যক্তির কাছে, বিশেষ করে কলকাতার মতো শহরে স্থান, উত্তম কুমার একটি জীবন্ত স্মৃতির চেয়ে অনেকটা সাংস্কৃতিক প্রতীক হিসাবেই বেশি পরিচিত। তারা মহানায়ক উত্তমকুমার নামটা একটি মেট্রো স্টেশনের ল্যান্ডমার্কের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে অনেক সহজে, কিন্তু দু-একজন ছাড়া উত্তমকুমারের ছায়াছবি যে উৎসাহ নিয়ে দেখে, আলোচনা করে, বা নস্টালজিক হয়ে পড়ে, তা কিন্তু নয়। এরা মহানায়ক উত্তমকুমারকে বরং বাঙালী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং আধুনিক অনুরণনের একটা স্তম্ভ হিসাবে বা বাংলা

সিনেমার একজন স্থায়ী আইকন হিসেবে খাড়া করে গর্ব বোধ করে। তার বেশী নয়।

সমাজ এতটাই পালটেছে, সামাজিক মূল্যবোধ এতটাই পালটেছে, দৈনন্দিন দিনগত পাপক্ষয়ের গতিপথে প্রযুক্তিগত তফাৎ এতটাই বেড়েছে যে, ক্রমবর্ধমান দূরত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এমন একটা পরিবেশ হয়েছে যে আজকের প্রজন্মের অনেক কিশোর-কিশোরী উত্তমকুমার বা তার চলচ্চিত্রের সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে অসুবিধা বোধ করে। শিশু কৈশোর কালে বাবা মা-র তাগিদে, রাজার পরিষদ দলের মত, কিছুটা ভালো ভালো দেবে বটে, কিন্তু মন থেকে, ভেতর থেকে তা ধারণ করে উঠতে পারে না। এ কথা শুনে রে রে করে উঠতে পারেন কিন্তু এটার মধ্যে বাস্তবতা আছে। এদের কাছে সাদা-কালো ছবিগুলো বড় ভয়াবহ, ছবিগুলো খুব ধীর গতির, কোনও অ্যাকশন নেই, বড় আবেগপ্রবণ ন্যাকামিতে ভরপুর, বড় প্যানপ্যান ও বিরক্তিকর। আমাদের রাগ হতে পারে কিন্তু এরা তাই বলে। বাড়ন্ত এই প্রজন্মগত ব্যবধানের ফলে আজ অনেক কিশোর-কিশোরী মহলায়ক উত্তমকুমারের চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাদের সাথে যুক্ত হওয়া কঠিন বলে মনে করে। মনে নিতে কষ্ট হয় - কিন্তু এটাই বাস্তব। আমরা যারা **Generation X** এর ধারে কাছে বড় হয়েছি, তারা উত্তমকুমারের চাহনিতে যে আকর্ষণ বোধ করি, তাঁর চলনে, বলনে, কথনে যে পুরুষত্বকে দেখতে পাই, **Generation Alpha**, বা এমনকি **Generation Z** তাকেই একপ্রকার নরম পুরুষত্ব বা মেয়েলী বলে মনে করে। এই প্রজন্মের সাথে খোলাখুলি কথা বলে এটাই মনে হয়েছে যে GenZ-এর সঙ্গে বা Gena-এর সঙ্গে মহলায়ক উত্তমকুমারের দৃঢ় সম্পৃক্ততার কোনও প্রমাণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে রেডিট সংস্থা একবার একটি সমীক্ষা করে। রেডিট ব্যবহারকারীদের কাছে থেকে পাওয়া তথ্য থেকে বোঝা যায় যে উত্তমকুমার তো দূরের কথা সামগ্রিকভাবে বাংলা আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহটাই কমে যাচ্ছে এই প্রজন্মের। কেউ কেউ হতাশা প্রকাশ করেছেন যে বাংলা চলচ্চিত্র ব্যাপকভাবে দেখা হয় না, এমনকি তাদের নিজস্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও। অধিকাংশের পছন্দ প্রায়শই বলিউডের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। নিন্দুকেরা বলেন এজন্য বাঙালিরাই দায়ী, হিন্দি সিনেমার আকর্ষণের কারণগুলি বাংলা সিনেমায় দেখালে তাঁরা তাকে বাঙালী সংস্কৃতির পরিপন্থী বলে মনে করেন। তাই আমেরিকাতে বঙ্গ সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করে বলিউডের শিল্পীকে দিয়ে নাচন কোঁদন না করালে পয়সা ওঠে না। সে যাই হোক আবার শিরোনামে ফিরে আসি।

ওদিকে বাংলাদেশের ক্লাসিক আইকন কিন্তু উত্তমকুমার নন - হবার কথাও নয়। তবে আমার জানা মতে উত্তমকুমার এখনও বাংলাদেশে, বিশেষ করে সেখানকার সিনেপ্রেমী বয়স্ক দর্শকদের মধ্যে গভীরভাবে সম্মানিত। নতুন প্রজন্মের কাছে কিন্তু নয়। সে দেশের সিনেপ্রেমীরা বাংলায় ছাড়াও এখনও উত্তম কুমারের প্রভাবকে স্বীকার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে একজন বাংলাদেশী সাংবাদিক, ২০২৪ সালে শর্মিলা ঠাকুর, ঢাকায় একটি মিডিয়া ইভেন্টে

উপস্থিত থাকার সময়, বাংলা চলচ্চিত্রে উত্তম কুমারের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার প্রশংসা করেছিলেন। তবে তা লোকদেখানো সামাজিকতা কিনা তা বলতে পারব না।

যাইহোক আবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। তরুণ প্রজন্ম **Generation Z**, **Generation Alpha**, এরা এখন মাল্টিপ্লেক্সগামী দর্শক। তারা রোমান্টিক এবং কমডি চলচ্চিত্র পছন্দ করে। তারা এখন মিডিয়া এক্সপোজার চায়। টিকটক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, ফেসবুক, ইউটিউবে রীল বা শর্টস বানাতে ব্যস্ত। তিন সেকেন্ডের বেশি এদের মনসংযোগ নেই - তাই বোধ হয় সামাজিক মাধ্যম কোনও কিছু ৩ সেকেন্ড ধরে দেখলেই তাকে একটি view বলে গণ্য করে। আর তাদের লগে লগে আমাদের প্রজন্মও শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে গিয়ে ইউটিউবে আর ফেসবুকে শর্টস আর রীল বানিয়ে টিআরপি (TRP) বাড়াতে চেষ্টা করি কিছু কড়ি কামাতে। এদের পাল্লায় পড়ে আমাদের প্রজন্মেরও কতজন আর উত্তমকুমারের ছবি দেখতে বসি - সন্দেহ আছে।

তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, উত্তম কুমার ১৯৮০ সালে মারা গেলেও, মহানায়ক উত্তমকুমার তাঁর নিজ মহিমান্বিত স্থানে চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন। নতুন প্রজন্ম তাঁকে ভিন্নভাবে ধারণ করবে, কিন্তু তিনি অবিনশ্বর থাকবেন বাঙ্গালীর হৃদয়ে। উত্তমকুমারকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম সেরা অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যিনি ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। উত্তম কুমারের নানান সৃষ্টি পশ্চিমবঙ্গে ভালোভাবে সংরক্ষিত আছে। সতজিৎ রায় তাঁকে "প্রকৃত তারকা" বলে অভিহিত করেছিলেন। ফোর্বস ইন্ডিয়া "নায়ক" ছবিতে তার অভিনয়কে "ভারতীয় সিনেমার ২৫টি সেরা অভিনয়"-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উত্তম কুমারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্রগুলি প্রেক্ষাগৃহে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে, যা সেগুলিকে নতুন দর্শকদের কাছে নিয়ে আসছে এবং তাদের কালজয়ী আবেদনকে আরও শক্তিশালী করছে। সাংস্কৃতিক কমিটি এবং ভক্তরা প্রতি বছর তাঁকে সম্মান জানাতে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর জন্মবার্ষিকী উদযাপনের মধ্যে রয়েছে নৃত্য, সঙ্গীত এবং বিশেষ অনুষ্ঠান করা হয় প্রতি বছর। ২০১২ সাল থেকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তাঁর নামে বার্ষিক "মহানায়ক সম্মান" পুরস্কার প্রদান করে আসছে। "মহানায়ক উত্তম কুমার মেট্রো স্টেশন" এর মতো ল্যান্ডমার্কগুলি তাঁর স্মৃতিকে প্রতিদিনের জনসচেতনতায় ধরে রাখতে সাহায্য করছে। তাঁর আসন্ন ১০০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য কলকাতায় একটি বড় প্রদর্শনী আয়োজন করা হচ্ছে, যেখানে দুর্লভ ছবি, ব্যক্তিগত নিদর্শন এবং স্মারক প্রদর্শন করা হবে। এ সবই তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহকে তুলে ধরে।

তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে অনেকেই লেখালেখি করেছেন। যেমন, সায়ন দেব চৌধুরীর লেখা "উত্তম কুমার: আ লাইফ ইন সিনেমা" বইটি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, গবেষণা-ভিত্তিক জীবনী। এটিতে তার চলচ্চিত্র ক্যারিয়ার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং উত্তরাধিকারকে গভীরভাবে পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের কাজগুলি প্রায়শই উচ্চশিক্ষায় - বিশেষ করে সাংস্কৃতিক ও চলচ্চিত্র

অধ্যয়নে - রেফারেন্স বা পাঠ্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এমনকি যদি এটি একটি আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমের অংশ নাও হয়, তাহলেও এর গুরুত্ব অপরিহার্য। হয়তো কোলকাতা সিনেম্যাটোগ্রাফিতে সিলেবাসে পড়ানো হবে - কে বলতে পারে। এই গবেষণামূলক ফলাফলগুলি একাডেমিক আলোচনায় এবং চলচ্চিত্র তত্ত্ব, দক্ষিণ এশীয় অধ্যয়ন বা সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন কোর্সে পড়ানো যেতে পারে। পরিশেষে বলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে বা একপ্রকার শৈল্পিক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চলচ্চিত্র নির্মাতারা আধুনিক দর্শকদের জন্য উত্তম কুমারের ব্যক্তিত্বকে পুনরুজ্জীবিত এবং পুনর্গঠিত করেছেন। সৃজিত মুখার্জি সাম্প্রতিক "অতি উত্তম" ছবিতে উত্তমকুমারের নানান আর্কাইভাল ফুটেজ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উত্তম কুমারের পর্দায় প্রত্যাবর্তন ছবিটির অভিনবত্ব বাড়িয়েছে। মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন সহ অনেকের প্রশংসা কুড়িয়েছে এই ছবিটি। আর এ ভাবেই মহানায়ক উত্তম কুমারের অব্যাহত সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিকতা হয়তো **GenZ** বা **Genα** ছড়িয়ে পরবর্তী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মহানায়ক উত্তমকুমারকে পুনরাবিষ্কারের সম্ভাবনার সুযোগ করে দেবে। মহানায়ক উত্তমকুমার বাঙালীর কাছে চিরকাল মহানায়ক হয়েই থাকবেন।

# শরতের ঠিকানা-C/O কলকাতা

**দেবলীনা মন্ডল দে**
ফিলাডেলফিয়া

সব শহরের একটা নিজস্ব ঋতু থাকে। কলকাতার সেই ঋতু-র নাম দুর্গাপূজা! এই ঋতুর আগমন উপলব্ধি করতে আমাদের ক্যালেন্ডারের প্রয়োজন হয়না, সম্মিলিত স্মৃতিই পূজার প্রধান দূত হয়ে বয়ে নিয়ে আসে সেই চিরন্তন উত্তেজনা, আনন্দ আর ভালোলাগা গুলোকে।

পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, বর্ষা শেষ হতে না হতেই চোখের সামনে ভিড় করে আসে একটা নীল-সাদা আকাশ, মনের মধ্যে জেগে ওঠে একটাই শহর। যে শহরের প্রতিটা রাস্তার নাম আমার মুখস্থ, অথচ যে রাস্তাগুলো দিয়ে আমি হাঁটিনি বহু বছর। স্মৃতির ভানায় ভর করে ঘুরে আসি সেইসব অলিগলি দিয়ে। স্মৃতির এই একান্ত ব্যক্তিগত যে ঋতুচক্র, তাকে একমাত্র বোঝা যায় প্রবাসে এসেই।

একসময় হয়তো ভাবতাম পুজো মানে চারদিনের এক বিরাট উৎসব আর স্কুলের একটা লম্বা ছুটি। তবে এখন বুঝি, পুজো আসলে অপেক্ষার আরেকটা নাম। সেই অপেক্ষা আসলে শুরু হয় পুজোর অনেক আগে অথবা সেই অপেক্ষা সারা বছর লুকিয়ে থাকে আমাদের ভেতরেই। এই অপেক্ষায় ভর করেই কলকাতা ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে তার একমাত্র মহোৎসবের জন্য। সেই প্রস্তুতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পুজোর আসল আনন্দ।

প্রবাসে থেকে যদিও সেই প্রস্তুতির শব্দ শোনা যায় না - এখানে শরৎ আসে অন্য রঙের সমারোহে। সে রঙও বড় সুন্দর। জানলা দিয়ে যে অন্যরকম এক আলো এসে পড়ে এখানে, তার সাথে আমার শহরের শরতের আলোর কোনো মিল নেই। তবু আশ্চর্যভাবে, সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকেই মন যেন নিজের অজান্তে সময়ের হিসেব পাল্টে ফেলে। তখন বুঝি, মানুষ যত দূরেই যাক, তার মনের ভেতরের ক্যালেন্ডারটা শেষ পর্যন্ত জন্মভূমির সময়েই চলে..

ঢাকের বোলের সেই আদিম স্পন্দন এখানেও প্রতিধ্বনিত হয় বটে; তবে এখানে পূজা মানে ছুটির দিন গুনে রাখা, সময়ের সঙ্গে লড়াই করে অঞ্জলিতে পৌঁছানো, আর ভিডিও কলে পাড়ার ঠাকুর দেখা দূরত্ব কমেছে প্রযুক্তিতে, কিন্তু গন্ধের কোনো অনলাইন সংস্করণ এখনও পাওয়া যায়নি, তাই শিউলি ফুলের গন্ধ, কাশফুলের ঢেউ, কিংবা ভোরবেলা মহালয়ার আবহ—সে সবই বেঁচে আছে ওই স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই।

প্রবাস আমাকে একটা অদ্ভুত শিক্ষা দিয়েছে। এই দূরত্ব আমায় বুঝিয়েছে, প্রাণের শহরকে ভালোবাসতে হলে কখনও কখনও তার থেকে দূরে সরে যেতে হয়। কাছে থাকতে আমরা শহরের ভাঙা ফুটপাথ, যানজট, অস্থিরতা আর দৈনন্দিন ক্লান্তিকেই দেখি; কিন্তু দূরে এসে বুঝি, শহর আসলে তার স্থাপত্য নয়, বাস করে মানুষের স্মৃতিতে, অস্তিত্বে। তাই এই পুজোর শহর কেবল মানচিত্রে নয়- সে থাকে ঢাকের প্রথম বোলে বুক কঁপে ওঠায়, আমার অষ্টমীর অঞ্জলীর চোখ বুজে আসায়, দশমীর বিষণ্ণ সন্ধ্যায় আর ঘরে ফেরার এক অসমাপ্ত ইচ্ছেয়। যে কি না ছিল আমার নিত্যদিনের 'অভ্যাস', সে ই হয়ে ওঠে আমার 'বিলাসীতা', আমার 'স্বপ্ন'! আর তাকে নিয়েই আমার পথ চলা, আমার অন্তর্যাত্রার উপাখ্যান !

# ভারত ভাগ্যবিধাতা

**গৌতম চ্যাটার্জি**
নিউ জার্সি

পূজনীয় বিষু কাকু,

শুরুতেই তোমাকে আর কাকিমাকে আমার প্রণাম জানাই, তুতুন দাকে আমার ভালোবাসা দিও। আমরা এখানে ভালো আছি। সরকার থেকে ৩০০০ টাকা করে দিয়েছে মাকে, একটু সুবিধা হয়েছে আর কি। বাবা চায়ের দোকানটা তুলে দেবে বলেছে, চিনি সত্তর টাকা হয়ে গেছে। আমি আর স্কুল যাচ্ছি না, পড়াশোনা করে কী হবে - চাকরি তো আর পাবো না। একটা টোটো কিনবো ভাবছি - হারুদাকে বলেছি, ওর পার্টিতে লাইন আছে।

আমাদের এখানে ভালো সরকার এসেছে। আমাদের ক্লাবঘরটা আর নীল রং নেই - ওরা ভালো রং করে দিয়েছে। আমরা এমনি ভালো আছি, তবে কাকু, অনেকদিন হয়ে গেলো বাড়িতে ভালো রান্নাবান্না হয় না। গ্যাসের দাম বেড়েছে। সব ওই চীন আর বিলেতের ষড়যন্ত্র - নইলে কি আর এরকম হয়?

আশু দা তো গলায় দড়ি দিয়েছে - কী একটা পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি লিক করেছিল - যাকগে, অত সত্যি জানি না। আশু দার মতো ছেলে যদি পড়াশোনা করতে গিয়ে মরে যায় - আমার আর কী হাল হবে। তোমরা কবে আসবে, তোমরা আসলে মা আবার ভালো মন্দ রান্নাবান্না করবে।

এবার ভাবছি পুজোয় চপের স্টল দেবো - দুগ্গা পুজোয় আমিশ হলে পাপ হবে। গরম গরম চপ - ভালোই বিক্রি হবে, কী বলো? ভাবছি পৈতে তো আছেই, এবার পুজো করাটা শিখে নেবো - কটা পয়সা রোজগার হবে - বাবার সুবিধা হবে। আসলে পুজো আচ্চা করা ভালো, তাই না - ওটাই তো আমাদের আসল শিক্ষা। ওটাই তো আমাদের ধর্ম - কী বলো। এইসব এখন যা শেখানো হয় স্কুলে, সেগুলো তো সব ইংরেজদের থেকে পাওয়া - ওগুলো শিখে কোনো লাভ নেই।

আসলে কাকু, আমরা খুব একটা ভালো নেই। হাতে একদম টাকাপয়সা নেই বাবার। চায়ের দোকানটা চলছে না। দুবেলা পেট ভরে খাওয়াটাই চাপের হচ্ছে। লাল সরকারের সময় তো বাবাদের কারখানাটা বন্ধ হয়ে গেলো। নীল সরকারের সময় যে কটা জমানো টাকা ছিল, সবই তো চিট ফান্ডে মার গেলো। নতুন সরকার তো সবাই ভালো বলছে - কিন্তু জানি না টাকাটা ফেরত পাবো কি না।

বঙ্কাই কাকা তো এখন নীল পার্টি ছেড়ে নতুন পার্টিতে গেছে - ওই তো সব পয়সা লাগাতে বলেছিল বাবাকে। বাবা বলেছে, এখন বঙ্কাই কাকা খুব ভালো হয়ে গেছে - নিশ্চয়ই আমাদের টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবে। তারপর আমাদের আর কোনো কষ্ট থাকবে না। তুমি যদি এই কদিনের জন্য কটা টাকা ধার দাও তাহলে একটু ভালো হয় - আমি কিছু একটা কাজ ধরে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো মাসে মাসে, কথা দিচ্ছি।

তাছাড়া বিল্টু দা তো বলেছে, রামের দেশে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দেশে, আমাদের মতো উচ্চবর্ণের লোকেদের কোনো কষ্টই হবে না। ভগবান আছেন - সরকার আছে - তারাই দেখবেন। তাছাড়া এখানে তো এখন ভালো সরকার এসে গেছে - সব ভালো হবে - তাই না?

**ইতিহাস পুরোনো হলেও সত্যি:-**

***During 34 years of CPI(M) rule in West Bengal (1977–2011), thousands of large, medium and small industrial units shut down; a state government Environment Department report later recorded 21,521 industrial unit closures in just the 2016–2021 window alone.***

*Source: ETV Bharat, reporting on a West Bengal government Environment Department report (2021).*

***During TMC rule in West Bengal: Saradha Group Scam (2013) - Affected roughly 1.7 million people. Rose Valley Scam (2013) - Affected roughly 1 million people.***

*Source: Saradha figure - IANS, via Business Standard, citing CBI chargesheet. Rose Valley figure - a rounded estimate; PTI/Business Standard (SEBI order) put the Holiday Membership Plan alone at ~2 million investors, while the government's 2025 official restitution drive has confirmed ~7.5 lakh (750,000) victims so far.*

***Some of the criticism against the current central government includes the 2026 NEET-UG paper leak, the Electoral Bonds scheme (later struck down by the Supreme Court), and the Adani–Hindenburg stock manipulation allegations.***

*Sources: Al Jazeera / CNBC (2026 NEET-UG paper leak); PTI, via Deccan Herald (Electoral Bonds verdict, 2024); Reuters*
*(Adani-Hindenburg allegations).*

সরকার বদলায়, রং বদলায়, সময়ও বদলায় - কিন্তু বদলায় না সমাজের বেঁচে থাকার লড়াই। হয়তো আমরাও বদলাই, কখনো বা লাল, কখনো বা নীল, বা গেরুয়া। কিন্তু বদলায় না খিদে, বদলায় না কষ্ট। তবু টিকে থাকি এটা ভেবে - কিছু ভালো নিশ্চয়ই হবে, বিধাতা মুখ তুলে চাইবেন।

# নামায়নী কথা

**শ্যামলী সেন রায়**

আজ থেকে একবছর আগের একটা রবিবারে মাধবের জীবনটা অন্য দিকে মোড় নিয়েছিল। সেদিনটার আগে পর্যন্ত সে যে কী পরিমাণ হতাশাগ্রস্ত ছিল সেকথা মনে করে এখনো তার হাসি পায়। মায়া তো এখনো কথা শোনাতে ছাড়েনা আর হা হা করে হাসে। এমনকি একথাও বলে —"সত্যি তুমি ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানতে না! এমন যে কেউ হয় তোমাকেই প্রথম দেখলাম। বাবা কী ভীতু কী ভীতু। সেদিন আমরা দুই বন্ধু ওরকম না করলে কী হত তোমার বলত!

মাধব হাসে —সত্যি কী বোকা আর ভীতু ছিলাম। আমি তো ডিপ্রেসনে চলে যেতাম। তুমি আমাকে বাঁচাতে! মাদার টেরেসা আমার!

তারপরই শুরু হয় তার নানা রকম দামালপানা। মায়ারাণী শাশুড়ির ভয় দেখিয়ে মাঝসময় মাধবের আলিঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যায়।

অফিসে এসে মাধব শুনল স্যার খোঁজ করছিলেন। টেবিলে রাখা জলটা খেয়ে স্যারের ঘর যায়।বাইরে থেকে নক করে।

—এসো

ভেতরে ঢোকে মাধব।

-ডেকেছিলেন স্যার?

-হ্যাঁ বোসো বলছি।

মাধব অপেক্ষা করে। স্যারের মেয়ে ভেতরে পেছনের দিকে সোফায় বসেছিল, স্বভাবতই হাতে মোবাইল নিয়ে খুটখুট। মাধব ঢোকার পর এবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার মুঠোফোনে ব্যস্ত।

-নতুন প্রোডাক্টের প্রেজেন্টেশন রেডি তো?

-হ্যাঁ স্যার। কালই তো লাস্ট ডেট।আমার টিমের সবাই রেডি।

-কালকের পর কি করবে? মানে আমরা অর্ডার পাব তো?

-১০০%স্যার।

-ঠিক আছে যাও।

-মায়াবনের দিকে লুকিয়ে একঝলক দেখে বেড়িয়ে এলো মাধব। নিজেরঘরের দিকে যেতে যেতে দাদুর ওপর একচোট বিরক্তি প্রকাশ করে মনে মনে। একটা নাম রেখেছিল বটে।

নিত্যমাধব! আজকাল এসব নাম কেউ রাখে! আর বাবাও তেমনি। এফিডেবিট করে নামটা বদলাতে পারতো। তা নয় পিতৃভক্তি দেখালেন। নিজের শশাঙ্ক নামটা তো বেশ ভালো তাহলেই হল ! তবু সে জোর করে নিত্য' বাদ দিতে পেরেছে। পরেছে মানে মুখেই। খাতায় কলমে নয়। নাম জানতে চাইলে ওটুকু ছেটেই বলে।

পরদিন অফিসের শেষে সেলিব্রশন। সবাই কে স্যার বাড়িতে ডেকেছেন। কিন্তু মাধব বেশি রাত পর্যন্ত থাকলনা। বাড়িতে চিন্তা করবে বেশি দেরি হলে। মা একাই যে! ফেরার সময় স্যারকে বলে দরজার দিকে যেতে যেতে একবার মায়াবনের দিকে চেয়ে দেখল। সে ভাস্করের সাথে কথায় ব্যস্ত। দরজা খুলে সবার আগে সে চলে যায়।

পরদিন অফিসে কত গল্প ভাস্করের। মাধবের কান জ্বালা করছিল। তবু চুপ করে শুনতে হয়। কারণ সে পুরনো দিনের মাধব, আধুনিক ভাস্কর নয়। ছোটবেলা থেকেই এই নামটা নিয়ে কমপ্লেক্সে ভোগে। সবাই ওকে "নেত্যমাধব" বলে ডেকে চিড় করত। সারাদিন অফিসের পর বাড়ি ফিরে আবার ফোন ল্যাপটপে অফিস করতে হয়। এটাই জীবন। তার মধ্যেই মাঝে মাঝে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। উদাস হয়ে যায় তখন। মাযাবন মাঝে মাঝে অফিসে আসে সে দেখেছে। কতবার মুখোমুখি হয়েছে কিন্তু দুজনের কেউই কারো সাথে কথা বলেনি। চোখাচোখি হয়ে চলে গেছে। অথচ ভাস্কর দীপন এদের সাথে কথা বলতে দেখেছে অনেকবার।

নিজেকে তবু সে সংযত রেখেছে, গায়ের পড়ে কথা বলতে যায় না। ওকে হয়ত অহংকারী বা দাম্ভিক ভাবে। ভাবুক তবু সে যাবে না। যদি ওর নাম নিয়ে কোনদিন ঠাট্টা করে বসে! উঁ! এই নাম টার জন্য ওর জীবনটা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। মায়ের কাছে প্রায়ই ঘ্যানঘ্যান করে এ নিয়ে। মা শুধু হেসে বলে -তোর এই ছেলেমানুষী কবে শেষ হবে বলতো? কত সুন্দর ছেলে তুই সবদিক দিয়ে নিজে বুঝিস না বাবা!
যারা ঠাট্টা করে তোকে তারা আসলে ঈর্ষা করে।
-দূরদূর! ভাল্লাগে না।

মাধব সত্যি সুদর্শন। তবে টল ডার্ক হ্যান্ডসাম নয়। ফর্সা সুন্দর, নরম চোখের দৃষ্টি, মাঝারি উচ্চতা, একমাথা কালো ঝাঁকড়া এলোমেলো চুল। যেন সত্যি কৃষ্ণ মাধব। শুধু গায়ের রঙটুকুই গৌর। গৌর মাধব বলা চলে।

আজও কাজের জন্য স্যার ওকে বাড়িতে ডেকেছেন। প্রায়শই এটা তিনি করেন। হয়ত ভরসা করেন বলেই। আজ ছুটি ছিল। রবিবার। বাইক নিয়ে একটু পাড়ার

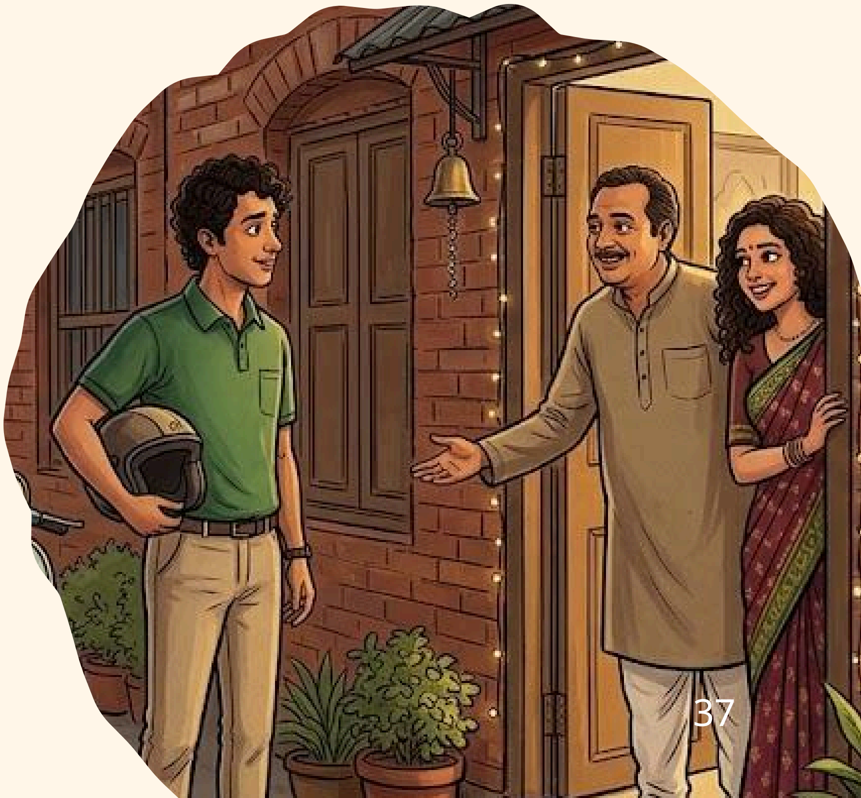

আড্ডার ঠেকে যাবে বলে ভাবছিল, তখনই স্যারের ফোন। দুপুরে যেতে বলে দিলেন। ওখানে ই খেয়ে নেবার কথাও। একটা দিনও কি শান্তি নেই! মাধব না করতে পারেনা। বস ডাকছে, চাকরী বাকরীর ব্যাপার। কিন্তু মা-টা আজও দুপুরে একা একা কী খাবে। রাতেই এসে একসাথে খাওয়া যাবে।

স্নান সেরে ফিটফাট হয়ে নেয়। অদ্ভুত সুন্দর লাগে ওকে দেখতে। হালকা সবুজ টি-তে যে কোন মেয়ে কেন ছেলেরাও ওকে ঘুরে দেখবে। একটু পারফিউম লাগায়। মায়ের ড্রেসিংটেবিলেই থাকে তারটাও। ওখানেই আবার রাখবে। মা আড়চোখে সব লক্ষ্য করে। জুতো পড়তে পড়তে ভাবে 'সেই আবার গম্ভীর মুখ মাযাবন আর স্যারের সাথে বসে খাওয়া। শুধু কাজের আর অফিসের কথা। বিরক্তিকর। মেয়েটা তো কোন কথাটথা বলেনা। বাবার মতই থাকে প্রায়। স্যারের মা-নেই মেয়েটাকে ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় শান্ত অন্তর্মুখী, কখনো মনে হয় অহংকারী।' স্যার ও কোনদিন ওঁর এই মা-নেই মেয়ের সম্পর্কে কিছু বলেন না। শুধু জানে সে সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর পড়ছে। ইংরেজী না বাংলা তাও সে জানেনা। তবে তার অনুমান বাংলাতে হবে। শুনেছে ফাইনাল পরীক্ষার পর সে এখন ডক্টরেট করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বিদূষী মেয়ে, ভাবে সে ।মায়াবনের সাজগোজ খুব সুন্দর। আজকালের মত ছেঁড়া জিন্স কাঁধ খোলা টিশার্ট কোনদিন পড়তে দেখেনি। শাড়ি অথবা কুর্তিতে সেজে থাকে। বেশ লাগে হঠাৎ সে সচেতন হয় মায়ের কথায়
-কি রে কী হল! বসে রইলি। বেরোবি তো!
তার মনে হয় হঠাৎ কেন সে মায়াবনের কথা ভাবছে। যত সব ফালতু! মায়াবনের প্রেমে পড়ল নাকি? বয়ে গেছে প্রেমে পড়তে। ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে চুলটা একবার হাত বুলিয়ে বাইরে এসে বাইকে স্টার্ট দেয়। কুড়ি মিনিট লাগলো পৌঁছতে। কমপ্লেক্সের গেটে নাম লিখে ভেতরে চলে যায়। তারপর থেকে যা যা হল তাতে সে উপলব্ধি করল সেও কিছু পেতে পারে তবে কিছু পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ও পরিস্থিতি তৈরী হতে হয়। ধৈর্য্য প্রয়োজন। স্যারের মতলবটাও সে বুঝেও বুঝতে পারেনা অথবা বুঝতে চায় না। মনে হয় স্যার হয় তো কোনদিন তাকে "বাবা মাধব চন্দ্র" বলে ডেকে বসবেন। নাম নিয়ে মাধবের এই হীনম্মন্যতা সে বুঝলেও কাটিয়ে উঠতে পারেনা। মাঝে মাঝে ভাবে সাইকোলজিস্ট দেখাবে। যদিও জানে তিনি বলবেন এফিডেবিট করিয়ে নিতে, সত্যি তাতেই ল্যাঠা চুকে যায়। এদিকে মায়ের সেন্টিমেন্টকেও উপেক্ষা করতে পারেনা। সবথেকে বড় কথা খাতায় কলমে হলেও মুখে তো নাম পাল্টাবে না। ঐ নামেই ডাকবে চেনা পরিচিত সবাই আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব। কী যে করবে সে বুঝে উঠতে পারেনা।

দরজায় বেল দিয়ে ভবেছিল মায়াবন দরজা খুলবে, কেন যে এমনটা ভাবে ভেবে নিজের গালে থাপ্পর মারতে ইচ্ছে হল। হলটা কী তার! দরজা খুলল অন্য একটি অচেনা মেয়ে, এ আবার কে রে বাবা! কোনদিন তো দেখিনি...
মেয়েটি দরজা খুলে
- মায়াবনবিহারিনী

বলে জোর ডেকে ওঠে। মায়া ঝংকার দিয়ে ওঠে
-আবার আমার নাম নিয়ে ঠাট্টা!
-বলতে বলতে এসে তাকে দেখে মেয়েটিকে সরতে বলে ওকে আসতে বলে।
--স্যার কোথায়?
-ভেতরেই চলে যান।
মায়াবনকে কোনদিন বাড়িতে শাড়ি পড়তে দেখেনি, আজ দেখলো। শ্যামলা মেয়েটিকে সবুজ পাড়ওয়ালা মেরুন শাড়িতে কি স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। চুল খোলা, টিপ পরেনি, কানে একটা ছোট টাব আর কিছু না। তাতেই অসাধারণ লাগছে মাধবের চোখে।। হাতে স্মার্টফোন সবসময়ের মত। একটু মৃদু হাসি বোধহয় ছিল মুখে। মাধবের পৃথিবী বদলে যাবার দশা। কোন রকমে স্যারের ঘরে পৌঁছে হেলমেট টা হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসে।
-লক্ষ্মী মাসী জল—

-লক্ষ্মীমাসী আজ নেই—
ভিতর থেকে কথা ভেসে আসে। আর জল নিয়ে আসে স্বয়ং মায়া। আজ এসব কি হচ্ছে মাধব বুঝতে পারেনা। জল খেয়ে গ্লাস ফেরত দেয় সাবধানে পাছে হাত ছুঁয়ে ফেলে। একটু পরে স্যার এসে পড়বেন। মাধব ল্যাপটপ খোল। ভদ্রলোক তো কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না।
আজ বেরনোর আগে মায়ের বলা কথাগুলো মনে পড়ল। আশ্চর্য হয়ে যায় এত কিছু ঘটছে সে কিছু জানেনা।
-হ্যাঁ রে তোর স্যার তো বিপত্তিক। একটি মেয়ে আছে। না?
-তুমি কি করে জানলে?
জানি তো! কথাও হয়
-অ্যাঁ সেকি গা? কি করে?
-কেন ফেসবুক থেকে। তুই তো সোস্যাল মিডিয়াতে কিছু করিসনা। তাই জানিসনা। আমি একদিন ওর লেখা একটা গল্প পড়ে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিলাম। তারপর ওর প্রোফাইল দেখে বুঝতে পারলাম। তার সাথে কথাবার্তা বলেনা?
বিস্মিত চমকিত মাধব। বলে নাতো। ও ওর মত থাকে। মনে হয় খুব অহংকারী।
-নারে না! মা মরা মেয়ে তো! জানেনা হয় তো সবকিছু, বোঝেনা। আমার তো মেয়েটিকে বেশ লাগে। বিদূষী মেয়ে।
তখনকার মত মায়ের সাথে কথা শেষ করে সে বেরিয়ে যায়।
এখন মায়াবনের ব্যবহার দেখে সে একটু অবাক হয়। যে মেয়ের গলাই শোনা যায় না, কথা শোনা যায় না, তাকে পছন্দ করে না অপছন্দ করে তাও বোঝা যায় না সে কিনা চেঁচিয়ে বন্ধুকে বলে, তাকে খাবার জল এনে দেয়! এতবড় আশ্চর্য ঘটনা এই প্রথম।
কিছু পরে লক্ষ্মীমাসি এসে খোঁজ নিয়ে যায় কিছু লাগবে কিনা। স্যারের সাথেও কাজের ব্যাপারে বিস্তারিত কথোপকথন হল। সারাদিন কাজই কেটে গেল। মেয়ে দুটির সাথে আবার দেখা হল লাঞ্চের সময়। পরিবেশন করার পর একসাথে খেতে বসল। মাধবকে দুই বন্ধু মিলে

বেশ যত্ন করছিল। রিনি তো স্যারের সাথে খুব বকবক করেই চলছে। মাঝে মাঝে ওর জোকস শুনলে মাধব হাসছিল। অনেকটা সহজ হয়েছিল সে।

কাজ শেষে বিকেলে তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকে। অন্যসময় চা টাএখানে খেয়ে যায়। স্যারের সাথে একসাথে মায়া থাকে, চা পরিবেশন করে চুপচাপ। বাপ মেয়ের কথা হয় অথচ মাধব নিজেকে ওদের সাথে সামিল করে উঠতে পারেনা। কোন মতে চা খেয়ে চলে আসে। আজ আরও আগে বেরিয়ে আসতে চাইল। মাধবের মন থেকে মায়াবনের আর ওর বন্ধুর কথা সরছে না কিছুতেই। যদি আবার ওর নাম নিয়ে ওরা হাসাহাসি করে। বেচারী এই ভয়ে আর বাতিকের জন্য মানসিক রোগীতে পরিণত হয়ে না যায়।
—মায়াবনের সাথে তোর কথা হয় না? মা বলছিল। বিরক্ত হয়ে বেশ রেগে জবাব দিয়েছিল
-যা একখানা নাম রেখেছ। ঐনাম শুনলে যে কোন মেয়েই আমার সাথে কথা বলার আগে হেসে ফেলবে।
আমি তাই চেষ্টা করিনি কথা বলার।
মায়ের অবাক চাহনি দেখে সরে এসেছিল।
আজ মায়াবন আর ওর বন্ধু ওকে আটকাল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে গিয়ে ওদের সামনে পড়ল!
—এ কি! চা না খেয়ে চলে যাচ্ছেন যে? মায়াবনের প্রশ্ন
—না না ঠিক আছে। একটু দরকার আছে তাই।
—কিছু দরকার নেই বসুন! নূপুর বেজে যায় রিনি
রিনি তোরা বোস, আমি চা করে বাবাকে ডেকে আনছি।

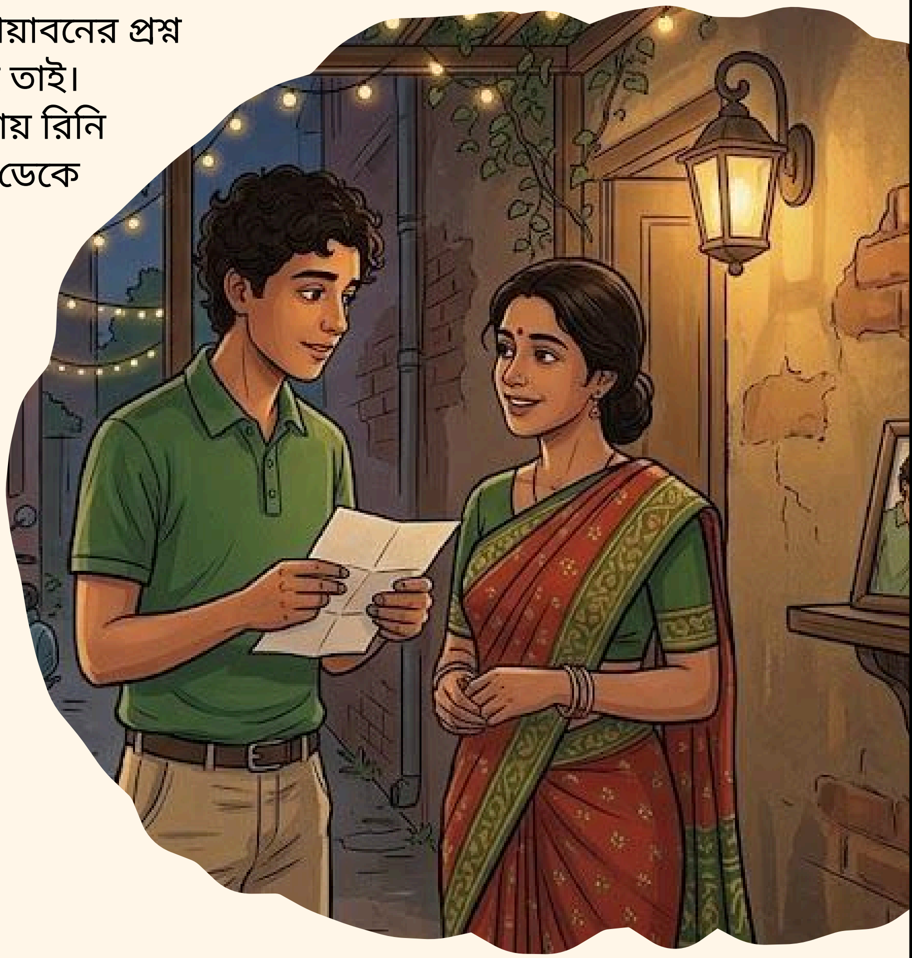

মাধব কিছু বলার অবস্থা নয়, ঘরে এসে সোফায় বসে ঘড়ির দিকে দেখে মাত্র সাড়ে চারটে বাজে। রিনির দিকে তাকায়, দেখল রিনি ওকেই দেখছে। চোখে চোখ পড়তেই হাসল। বলল —আমি রিনি। মায়াবনের বন্ধু। আমরা পরস্পরকে ঐ নামে ডাকি। কবিতা নিয়ে নামের সাথে মিলিয়ে খেলা আমরা ভীষণ উপভোগ করি। আপনি খুব অবাক হয়েছেন তো!
মাধব আমতা আমতা করে।
—না মানে এত বড় নাম ধরে ডাকা

যায় না কি -সবসময় ডাকি নাতো, মাঝে মাঝে।
-ও
সকলের সাথে চা নিয়ে বসে মাধব কেন যেন আজ একটু সহজ হয়ে দুচারটে কথা বলে ওদের সাথে। কি মনে হতে সাহস করে মায়াবনকে ওর মায়ের কথা ও বলে ফেলল। দেখা গেল মাধব ব্যতীত সবাই সব জানে। প্রচণ্ড রকম অপ্রতিভ হয় সে।
বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এতক্ষণ কি ঘটল না ঘটল ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কাগজের মোড়ক সামনে এসে পড়ল। তুলে নিল কাগজটা, আজ সে শেষ দেখে ছাড়বে। মোড়কটা খুলে দেখে ওতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা "মাধব তুয়া অভিসারক লাগি.... মায়াবনবিহারিনীহরিনী" তারপর একটা মোবাইল নম্বর। মাধবের চোখ বিস্ফারিত!
তারপর তার বাইক পক্ষীরাজ ঘোড়া!
সেই রাতেই ঐ নম্বর থেকে একটা কল এলো। ঐ নম্বর তখন মাধবের মুখস্থ, তাই আর কোনভাবে আমতা আমতা করেনি সে। সপ্রতিভ ভাবেই কথা বলতে পেরেছে।

# ইন্টারনেটের নাগরিক

**শাশ্বতী চাকী**
ফিলাডেলফিয়া

মুহূর্ত সকাল:

সকাল শুরু হওয়ার আগেই যেন শুরু হয়ে যায় আমাদের ডিজিটাল জীবন। ঘুম ভাঙার পর জানালার বাইরে নতুন দিনের আলো দেখার আগেই হাত চলে যায় মোবাইলের পর্দায়। রাতের জমে থাকা মেসেজ, ই-মেইল, খবর, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম—সবকিছুর খোঁজ নিতে নিতে শুরু হয় সকাল। আমরা যেন ঘুম থেকে উঠে দিনের মুখোমুখি হই না; সকাল শুরু হয় সূর্যের আলোয় নয়, স্ক্রিনের আলোয়।
পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমি এখন নিত্য ট্রেন-ট্রলি যাত্রী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়—সকালের ব্যস্ত সময় কিংবা বিকেলের ক্লান্ত সময়, প্রায় সবার চোখই মোবাইলের পর্দায়। একই ট্রলিতে বসে থেকেও প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের ছোট্ট ডিজিটাল জগতে বন্দী।
কেউ খবর পড়ছে, কেউ ই-মেইলের উত্তর দিচ্ছে, কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডুবে আছে। কেউ Facebook বা Instagram দেখছে, কেউ আবার হেডফোন কানে দিয়ে গান শুনছে। কেউ AI-এর সাহায্যে দিনের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে।
কখনও মনে হয়, আমরা কি সত্যিই যাত্রা করছি? নাকি একই সঙ্গে দুটো পৃথিবীতে বসবাস করছি—একটি বাস্তব, আর অন্যটি একটি ছোট্ট আলোকিত পর্দার মধ্যে?
মোবাইল আমাদের পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। দূরের মানুষকে কাছে করেছে, তথ্যকে করেছে সহজলভ্য, কাজকে করেছে দ্রুত। কিন্তু সেই সুবিধার আড়ালে নিঃশব্দে হারিয়ে যাচ্ছে কিছু ছোট ছোট মুহূর্ত—জানালার বাইরে সকালের আকাশ দেখা, অপরিচিত সহযাত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলা, কিংবা কিছুক্ষণ নিজের চিন্তার সঙ্গে একা থাকা। আজ স্কুল ছুটির পর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কয়েকজন স্কুলপড়ুয়া ব্যস্ত রিল বানাতে। কারও হাতে মোবাইল, কেউ ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে নাচছে, আবার কেউ বারবার একই দৃশ্য ধারণ করছে। চারপাশের যানবাহন আর পথচারীদের কথা যেন তাদের মনেই নেই। প্রথমে দু-একজন পথচারী অনুরোধ করলেন, "একটু পাশে দাঁড়াও, সবাইকে যেতে দাও।" কিন্তু তাতেও বিশেষ কাজ হলো না। ধীরে ধীরে কথাকাটাকাটি শুরু হলো। মুহূর্তের মধ্যেই সেই সামান্য বিষয়টি বড় ঝগড়ায় পরিণত হলো। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে শেষ পর্যন্ত

পুলিশকে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হলো।ফিরে আসার পথে মনে হলো—ডিজিটাল জীবনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনটাকেও কি আমরা একটু গুরুত্ব দিতে পারি না?

মুহূর্ত রাত:

শহর ঘুমায়নি, ঘুমিয়ে পড়ার অভিনয় করছে। কেবল তার জানালাগুলো একে একে অন্ধকার হয়ে আসে, আর মানুষের ভিতরের আলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
বারান্দার রকিং চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি। হাতে সিগারেট। সামনের ফ্ল্যাটের কয়েকটি জানালা তখনও জেগে। পর্দার ফাঁক দিয়ে নীল আলো বেরিয়ে আসছে—হয়তো টেলিভিশনের, হয়তো ল্যাপটপের। হয়তো কোনো মানুষের ক্লান্ত আঙুল স্ক্রল করে যাচ্ছে মোবাইলের স্ক্রিনে। সেই আঙুলও হয়তো ভুলে গেছে, কী খুঁজছিল।
রাত তখন ১২:১০। রাস্তার কুকুর ডাকছে। পাশের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে বাসন রাখার শব্দ শোনা গেল। হাতের সিগারেটটা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। আমার আঙুল অকারণে Android-এর স্ক্রিনে ছুঁয়ে গেল। আর তখনই চোখে পড়ল—“Happy to share—got a job.”
তার নিচে 1.1K viewers। অনেকগুলো নাম। অনেকগুলো অভিনন্দন। আর 279 জন লিখেছে—“Congratulations!” “Well deserved!” “So happy for you!”
এই 279 জনের মধ্যে কতজন সামনাসামনি একে অপরকে চেনে, জানা নেই। কতজন সত্যিই আনন্দিত, আর কতজন শুধু অ্যালগরিদমের কাছে নিজের উপস্থিতির প্রমাণ রেখে গেল—সেটাও এক বিস্ময়। আজকাল ইন্টারনেটে, বিশেষ করে GEN-Z এর যুগে, আমাদেরভূতিরও যেন কিছু sharable template আছে।
কিছু বুঝতে না পারলে বলি—“Make it make sense.”
কোনও অন্যায় দেখলে—“Do better.”
পুরস্কার পেলে—“Humbled.”
চাকরি পেলে—“Thrilled!”
অথচ রাতের খাবারের টেবিলে আমরা কেউ বলি না—“মা, I’m thrilled to announce যে মুরগির ঝোলটা exceptional হয়েছে।” বললে মা সম্ভবত একটু চুপ করে বিস্মিত হবে। তারপর সরল ভাষায় বলবে—চোখটা আগে ফোন থেকে সরাও। তারপর মুরগির ঝোলটা খাও। এই কথাটার কোনও সাহিত্যিক সৌন্দর্য নেই। আছে একটা আশ্চর্য সত্যি। সেখানেই হয়তো বাস্তব পৃথিবী অল্প একটু বেঁচে আছে।
কানাদীয় দার্শনিক ও মিডিয়া-তাত্ত্বিক মার্শাল ম্যাকলুহানের কথা মনে পড়ে—মাধ্যম শুধু কোনো বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় না; ধীরে ধীরে সেই মাধ্যমই আমাদের দেখার, ভাবার এবং অনুভব করার পদ্ধতিকে বদলে দেয়।
অন্যের সাজানো ডিজিটাল জীবন, সাফল্য কিংবা আনন্দের সঙ্গে নিজের জীবনকে তুলনা করতে করতে একসময় আমাদের স্বাভাবিক বাস্তবতাকেই অসম্পূর্ণ বা অস্বাভাবিক বলে মনে হতে শুরু করে।

শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি এটাই—আমরা ধীরে ধীরে এমন এক শহরে বাস করতে শিখেছি, যেখানে সবকিছুই যেন আসল, অথচ কিছুই পুরোপুরি বাস্তব নয়।
আয়নার মধ্যে শহর দেখি—শহর নয়, এটা শহরের অভিনয়।
কেউ কষ্ট পেলে তার পাশে বসার বদলে আমরা একটা ❤️ পাঠিয়ে দিই।
কেউ একা থাকলে দরজায় কড়া নাড়ার বদলে লিখি—“Take care.”
সম্পর্কের উষ্ণতা কমে যায়, কিন্তু notification-এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।
আর একদিন বুঝতে পারি—আমাদের চারপাশে মানুষ অনেক, অথচ কথা বলার মতো মানুষ কম।
সেই একাকিত্বেরও আমরা নতুন একটা সুন্দর নাম দিয়েছি—
“Protecting my Peace.”
হয়তো তাই, দিনের শেষে নিজের জীবনের দিকে একবার তাকানো দরকার। সেখানে সত্যিই আমি কি আছি? নাকি আমিও ধীরে ধীরে আমার জীবনের এমন একটি সংস্করণ তৈরি করে ফেলেছি, যেটি শুধু অনলাইনে দেখানোর উপযোগী?
প্রশ্নটা আরও ব্যক্তিগত—আমি কি সত্যিই আমার জীবনটা বাঁচছি, নাকি শুধু আমার জীবনের একটা সুন্দর online-compatible সংস্করণ পৃথিবীকে দেখিয়ে যাচ্ছি?

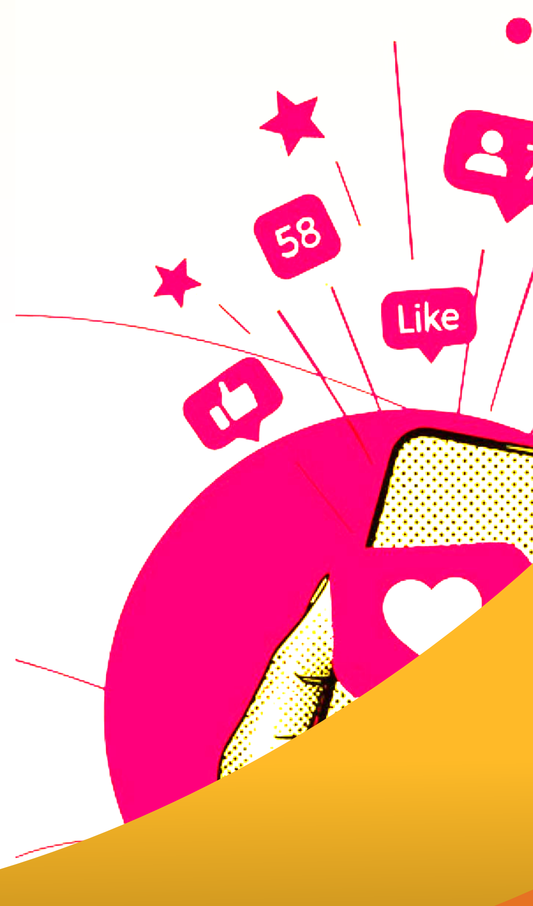

# আমেরিকার বুকে বাংলা বুক ক্লাব

**রণিতা চক্রবর্তী**
পেন্সিলভেনিয়া

আমরা বাঙালীরা আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে বিশেষ গর্ব অনুরাগ বোধ করি একথা সত্য। পৃথিবীর যেখানেই যাই না কেন বাংলায় কথা বলতে পারলে, পছন্দের বাংলা গান, কবিতা চর্চা করতে পারলে আপামর বাঙালী আনন্দ অনুভব করে থাকে। এই বিশ্বায়নের যুগে অসংখ্য বাঙালী নিজের দেশের বাইরে বেরিয়ে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিন দেশে গিয়ে থিতু হয়ে বহু বাঙালীই আগে খুঁজে নেয় তাদের আশেপাশে থাকা বাঙালী ক্লাব বা বাংলা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র। বিদেশে এই সব ক্লাব বা সোসাইটির সদস্যরা হয়ে ওঠে একে অন্যের বন্ধু, আত্মীয়সম; একসঙ্গে মিলে মেতে ওঠে বারো মাসে তেরো পার্বণের উদযাপনে। বৈশাখে পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, আশ্বিনে মা দুর্গার বন্দনা, কার্তিকে কালি মাতার আরাধনায় মেতে ওঠে কলকাতা থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, অস্ট্রেলিয়া থেকে ইউরোপের প্রাগ শহরও। আর সেই সঙ্গে চলে বাঙালীর সংস্কৃতি চর্চা। শুধু যে নিজেরাই নাচ, গান, কবিতা চর্চা করেন এমন নয়, কলকাতা থেকে আনা হয় বিশিষ্ট শিল্পীদের। তাঁরাও জমজমাটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সবাইকে বাৎসরিক আনন্দের ডোজ দিয়ে দেশে ফিরে যান।

অভিবাসী জীবনের বেশ অনেকগুলি বছর পার করে আসায় এগুলির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আমাদের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। উৎসবের হৈচৈ, জমাটি গল্প, অতিথি শিল্পীদের দেওয়া মনোরঞ্জনে মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বটে তবে সাহিত্যপ্রেমীর মনে কোথাও একটা ফাঁক থেকে গেছে। কারণ, সংস্কৃতি চর্চা

বা উৎসবের উদ্যোগ যতটা দেখেছি, বাঙালীর বিশ্ব-সমাদ্রিত সাহিত্যের চর্চা তেমন চোখে পড়েনি। হ্যাঁ, পূজার সময়ে বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকা বের হওয়ার চল অবশ্যই আছে, কিন্তু সাহিত্য চর্চা তাঁর থেকে একটু ভিন্ন। কিছু কিছু মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকার কথা শুনেছি বটে কিন্তু সেগুলির যতটা চর্চা বা সমাদর হওয়া উচিত ততটা হতে দেখিনি। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী হওয়ার দরুন এই অভাবটা অনেকদিনই বোধ করছিলাম। তাই ২০২৩ শালে আমেরিকার পূর্বতটে অবস্থিত ট্রাই-স্টেট অঞ্চলের (ডেলাওয়ার, নিউ জার্সি, পেন্সিলভেনিয়া) কিছু বন্ধুরা মিলে "বোল্ডলি বেঙ্গলি" নামের একটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম তৈরি করলাম আর সেখানেই খুলে ফেললাম একটি ভার্চুয়াল বুক ক্লাব।

আমাদের বুক ক্লাবের পথ চলা শুরু হল ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে। যার সাহিত্য দ্বারা আধুনিক বাঙালীর মননের ভিত্তিপ্রস্তর গঠিত হয়েছে সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোট গল্প "স্ত্রীর পত্র" দিয়ে আমরা শুরু করলাম। সেই থেকে প্রতি মাসের চতুর্থ রবিবার আমেরিকার পূর্বতটের সময় রাত্রি আটটায় আমরা, অর্থাৎ এই বুক ক্লাবের সদস্যরা অন্তর্জালের একটি অ্যাপে (জুম বা গুগুল মিট) জুটে যাই বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা বা চর্চা করতে। আমাদের ক্লাবের সঞ্চালক সন্দীপ মজুমদারের সুদক্ষ পরিচালনায় প্রতি মিটিং ঠিক আটটায় শুরু হয়, দিনের আলোচ্য গল্প বা বই নিয়ে আলোচনা, নির্বাচকের ও অন্যান্য সদস্যদের মতামত, সাহিত্যের বিভিন্ন দিক, তার মধ্যে থেকে উঠে আসা সমাজের ছবি বা দর্শন, ভাষা ও ব্যাকরণের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা চলে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট। এরপর আগামী দিনের আলোচ্য গল্প বা বইয়ের নির্বাচন পর্ব সেরে ন"টার মধ্যে ক্লাবের কার্যক্রম শেষ হয়।

এই বুক ক্লাবের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত আমরা বাংলা সাহিত্যের বত্রিশটি সৃষ্টি পড়েছি, শুনেছি এবং আলোচনা করেছি। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছোট গল্প যেমন আশাপূর্ণা দেবীর লেখা "স্টিলের আলমারি", বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা ছোট গল্প "শিউলিমালা", জ্যোতির্মালা দেবীর লেখা "নীল রক্ত"। তবে কিছু উপন্যাসও রয়েছে যেমন কালকুটের লেখা "অমৃতকুম্ভের সন্ধানে" বা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "গৌড়মল্লার"। এছাড়াও আমরা পড়েছি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা প্রথম ইংরাজি উপন্যাস "Rajmohan's Wife" থেকে নির্বাচিত অংশ। আমরা পড়েছি আধুনিক কিছু লেখকের লেখা, সদস্যদের নিজেদের লেখা এবং অন্যান্য ভাষাতে লেখা বাংলায় অনুদিত সাহিত্য। বর্তমানকালের বাংলা লেখকদের মধ্যে আমরা পড়েছি কবিতা সিংহের লেখা "চারজন রাগী যুবতী" যেটি আমাদের ক্লাবের সদস্যা শমীতা দাশ দাশগুপ্ত অনুবাদ করেছেন। আরও একজন নতুন লেখক শতদল মিত্রের লেখা "শাল গাছ অথবা একটি অলৌকিক উপাখ্যান"ও পড়েছি। এখানে আরও কিছু উদাহরণ দিই। নিউ জার্সির বাসিন্দা লেখিকা অদিতি ঘোষ দস্তিদারের লেখা "পরশ থাকুক হৃদয় ভরা", পেনসিলভানিয়া অতীশ চক্রবর্তীর লেখা বই "প্রবাসের টুকরো টাকরা" থেকে নির্বাচিত কলাম - এসবও পড়েছি।

ইংল্যান্ডের বাংলা সাহিত্যিক বিমান মল্লিকের লেখা “দূরের দুর্গা” বইয়ের নির্বাচিত কলাম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমরা সুনীল গাঙ্গুলির লেখা “সেই সময়” উপন্যাসের থেকে নেওয়া নির্বাচিত অংশও যেমন পড়েছি তেমনি পড়েছি রুশ ভাষার সাহিত্যিক নিকলাই গোগোলের লেখা “দি ওভারকোট” ছোট গল্পের বাংলা অনুবাদ।

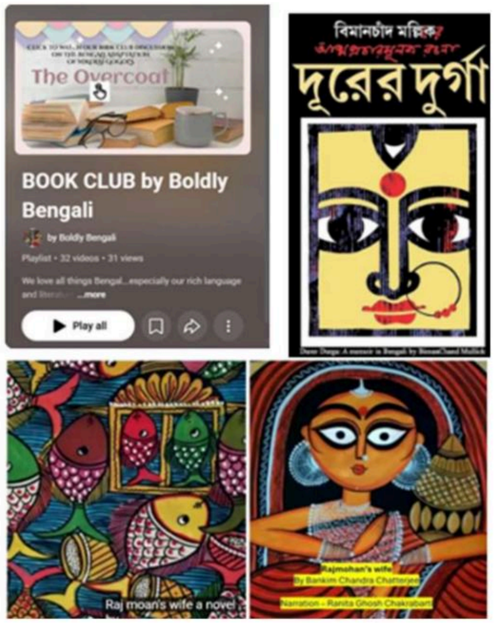


আমাদের এই ক্লাবটি আড়াই বছর পার করে তিন বছর পূর্ণ করতে চলেছে। ক্লাবের শুরুতে গোটা দশেক সদস্য সংখ্যা এখন বেড়ে চল্লিশে দাঁড়িয়েছে। এই কটা বছরের যাত্রা পথে আমি নিজে অনেক নতুন পাঠক, লেখক, সাহিত্য অনুরাগী বন্ধু পেলাম তাদের থেকে অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি, বাংলা ভাষা সাহিত্য পাঠের ভাণ্ডারে বত্রিশটি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি যোগ হয়েছে, সাহিত্যের কিছু অজানা দিক খুলে গেছে, ব্যাকরণ ও ভাষার বিন্যাস ও প্রয়োগ নিয়ে নতুন কিছু শিখেছি। এছাড়াও অন্যান্য সদস্য বন্ধুদের মতামত, আলোচনা থেকে উঠে আসা তথ্য থেকে চেনা সাহিত্যকে অন্যভাবে দেখতে শিখেছি। আর প্রতি মাসে অন্তত একটি করে সাহিত্য পাঠ করার ও অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার আনন্দও তো কম নয়। আশা রাখি আমাদের এই বাংলা সাহিত্য চর্চার দলটি আরও দীর্ঘ পথ যাত্রা করবে।

আমাদের প্রত্যেকটি আলোচনা পর্ব ইউটিউবে সংরক্ষণ করা থাকে যাতে যে কেউ যে কোনও সময়ে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্ত থেকে আমাদের যে কোনও পর্ব পুনরায় শুনতে পারেন। প্রতি মাসের চতুর্থ রবিবারে ঠিক রাত আটটায় 'মরীচিকার' কোনও বন্ধু যদি এই ক্লাবে যোগ দিতে চান তাঁরা আমাদের ই-মেল করতে পারেন **threedstories415@gmail.com** আমাদের এই ঠিকানায়।"

# 71 Dover Lane

**Arunava Saha**

It was one o'clock in the morning in a quiet suburb of Pennsylvania. Amit was still awake, buried under slides and technical jargon, preparing for an important presentation the next day. After hours of staring at his computer screen, his brain felt completely saturated. He needed something—anything—to clear his head. He walked to the refrigerator, hoping to find a beer. Nothing. Not a single bottle. "Brilliant," he muttered to himself. Disappointed, he stepped outside with a cigarette instead. The moment he opened the door, an icy gust of wind slapped him across the face. The entire neighborhood had disappeared beneath a blanket of snow. "Looks like it snowed all night."

He lit his cigarette and took a deep drag. The wind seemed determined to cut through every layer of clothing and freeze his blood from the inside out. Halfway through the cigarette, another thought crossed his mind. Beer. The craving had only gotten worse. He went back inside, grabbed his winter coat, pulled on his gloves, and headed toward the nearest gas station. Outside, he stopped and stared at his car. It looked less like a vehicle and more like a snow-covered sculpture. "What the heck?" Too desperate to spend twenty minutes digging it out, he started walking.

The gas station at 71 Dover Lane was nearly empty. Amit entered, shivering from the cold. Behind the counter sat Patricia, the night cashier. Amit had been coming here regularly for months and had watched her expand at a pace that seemed to defy biology. America's fast-food industry deserved some of the blame, he thought.

Then he remembered his own recent relationship with burgers and fries and laughed at himself.

Seeing him walk in, Patricia smiled.
"Hi, Amit. How are you?"
"Good. How's it going, Pat?"
"Can't complain."
Amit grabbed a six-pack of Corona and brought it to the counter. "It's freezing tonight. Five degrees."
Pat shook her head. "I've lived here fifteen years and don't remember it ever feeling this cold."
"Hmm. Can I get a pack of Marlboro Lights too?"
Pat grabbed the cigarettes and rang everything up.
"That'll be $15.35."
Amit swiped his credit card, signed the receipt, and smiled. "Have a good night."
"You too."

The moment he pushed open the door, everything changed. Two men burst into the store. Before Amit could react, one of them grabbed him from behind and jammed a handgun against his head. The other rushed toward Patricia and pressed a knife against her neck. The transformation from ordinary to terrifying happened in less than two seconds. Amit's mind struggled to catch up.

"Take out all the cash, you fing bch!"*

Patricia froze. The robber tightened his grip and screamed again. She began trembling and opened the cash drawer. Meanwhile, the man holding Amit noticed the six-pack in his hand.
"You drink this Mexican st, you son of a bch?"
He snatched the beer away. The second robber started stuffing cash into the pockets of his oversized jeans. Then Patricia did something unexpected. She screamed.

"HELP!"
The sound echoed through the store. The robber reacted instantly. With a curse, he pulled back the knife and drove it toward her stomach with all his strength.

Amit felt his heart stop. Then something remarkable happened. Patricia was still standing. Amit rushed toward her. A few drops of blood trickled down the right side of her belly. Just a few. The knife had barely penetrated. The attacker stared in disbelief. Apparently, years of fast food had created a layer of natural body armor that no one had anticipated. The knife hadn't even made it half an inch. The robber looked completely confused. Patricia looked confused. Even Amit was confused. For a brief moment, everyone in the store seemed equally surprised by the outcome.

"Get the fk out of here!" one robber shouted.

The two men bolted from the store and disappeared into the snowy night. Amit immediately called 911. The police arrived within minutes. Patricia was taken to the hospital while Amit accompanied her to give a statement. After examination, the doctors treated her as an outpatient. The wound was minor and required little more than cleaning and a small bandage. By the time everything was finished, it was nearly 3:30 in the morning. The police dropped Patricia off at home and then gave Amit a ride back to his apartment.

The next day, Amit delivered his presentation without incident. At lunchtime, he found himself standing in front of the Big M. He hadn't eaten there in almost two years. He thought about Patricia. He thought about the knife. He thought about survival. Then he walked inside and ordered the largest burger on the menu with a giant Coke. Not Diet Coke. Regular Coke. Because after what he had witnessed the night before, a little extra protection didn't seem like such a bad idea.

## Bronze Sponsor

## Bronze Sponsor

# Bronze Sponsor

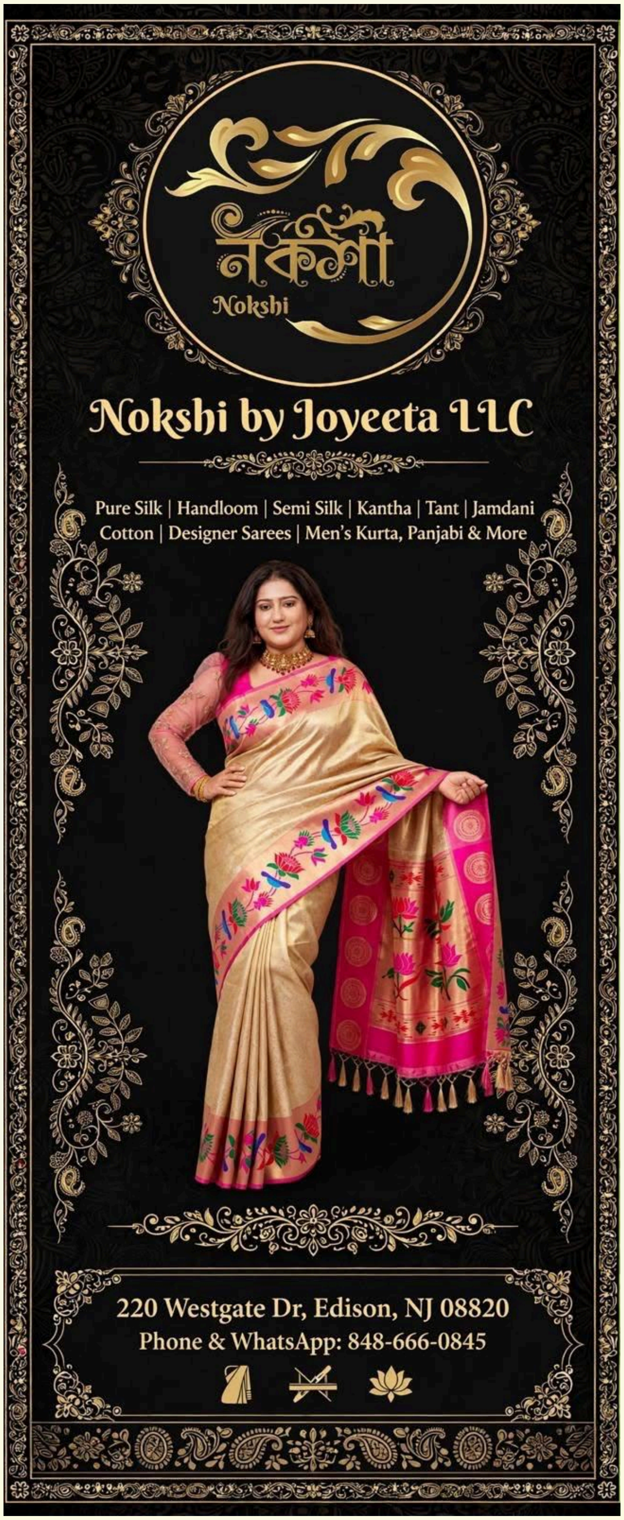

# The Timeless Masters

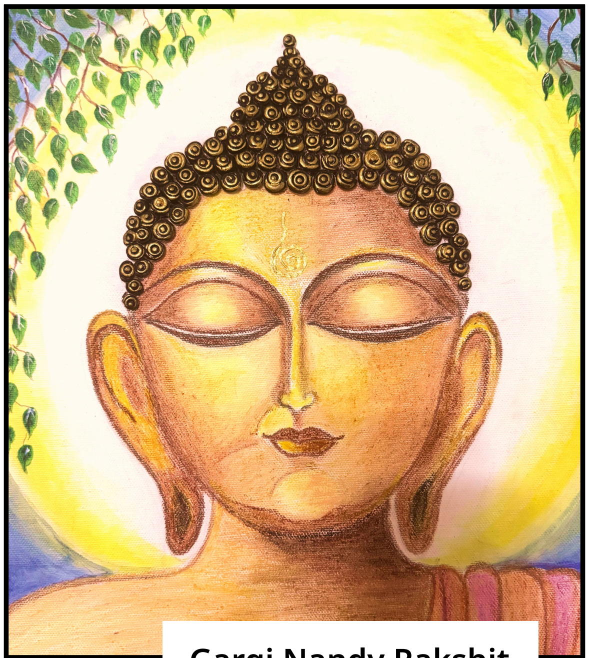

Gargi Nandy Rakshit

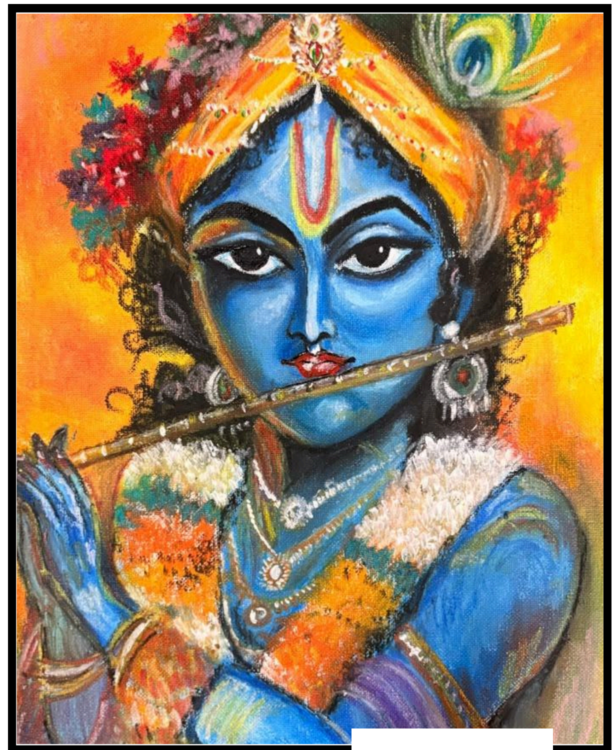

Shreya Das

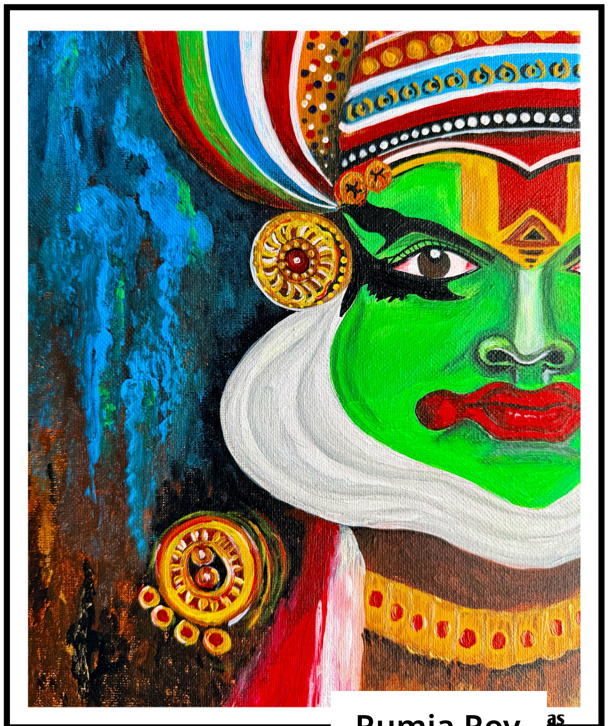

Rumia Roy

Debolina Mandal Dey

# The Timeless Masters

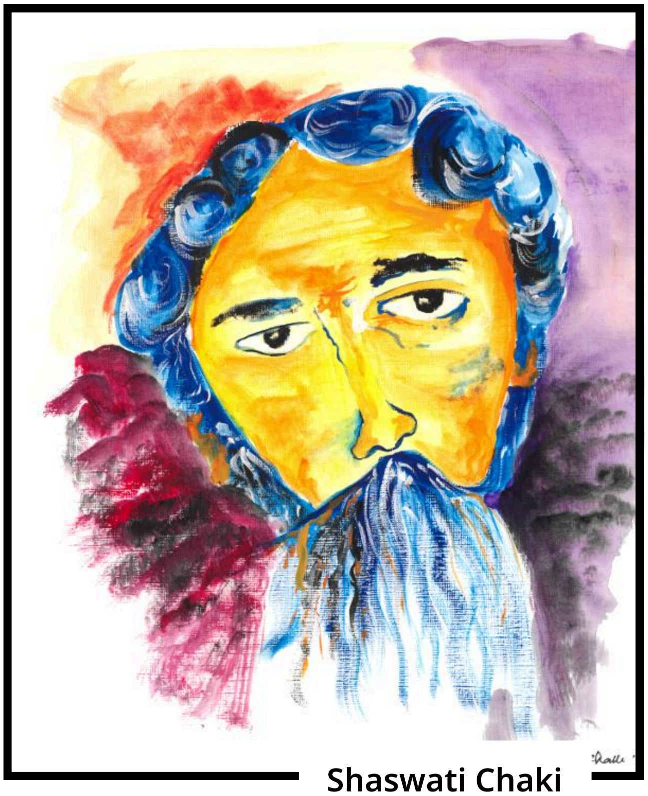

Shaswati Chaki

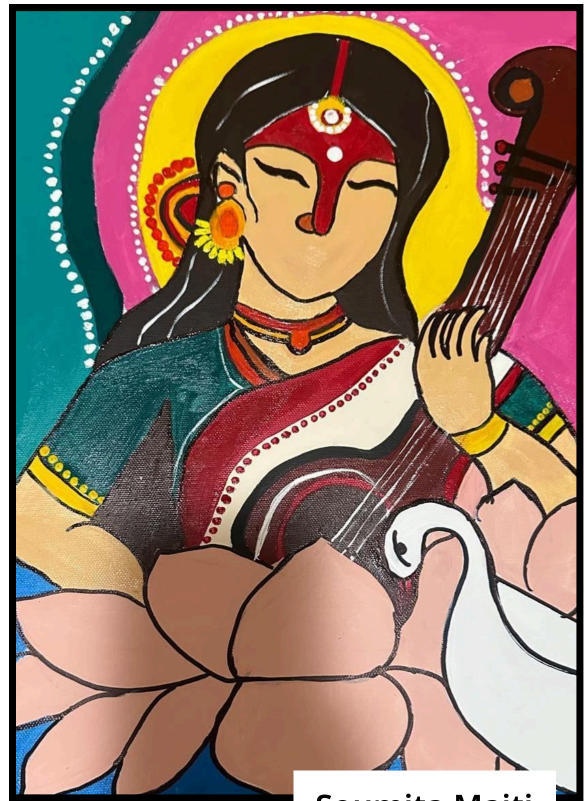

Soumita Maiti

Dipankar Bose

Koyel Mukherjee

Little picassos

Ashmita Mukhopadhyay (Grade-12)

Anwita Saha(Grade-7)

Srujanika Roy(Grade-6)

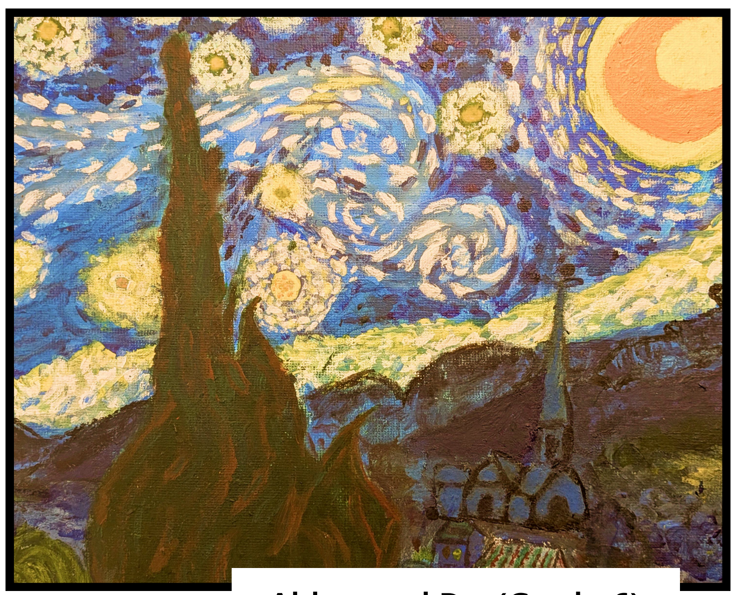

Abhraneel Das(Grade-6)

# Little picassos

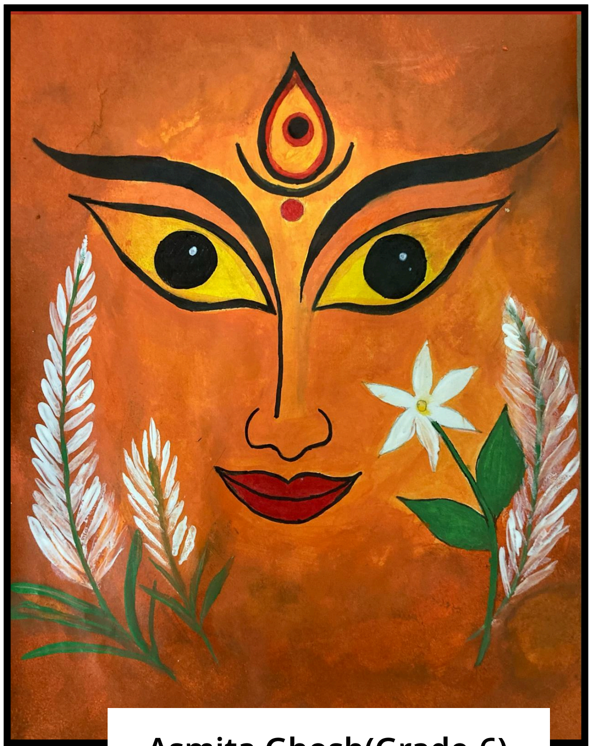

Asmita Ghosh(Grade-6)

Riyanshi Banik(Grade-5)

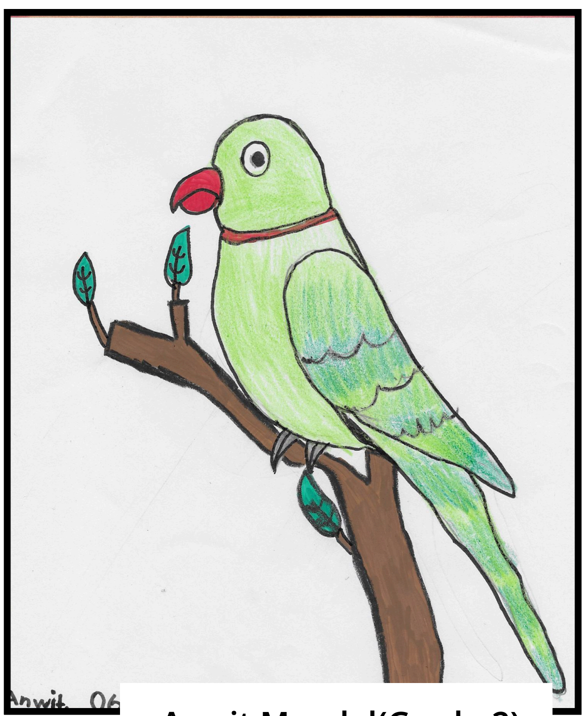

Anwit Mandal(Grade-2)

Dishita Ghosh(Grade-3)

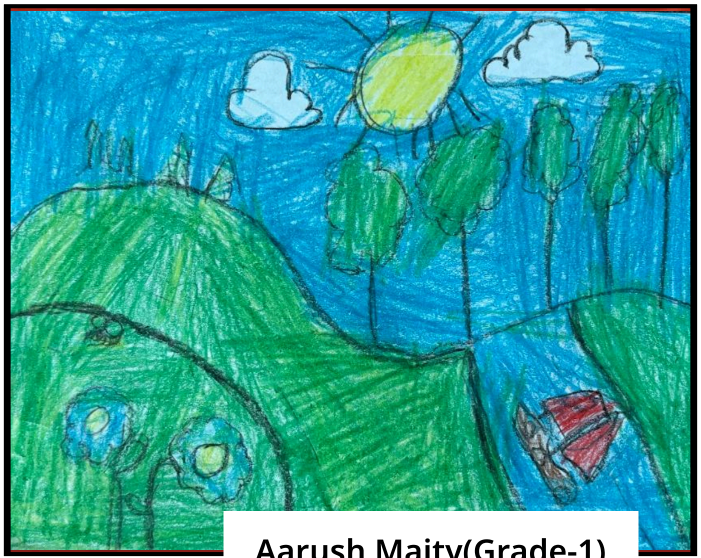

Aarush Maity(Grade-1)

Little picassos

# Motion In Stillness

Paterson Great Falls

Bushkill Falls

Captured By : Debasish Pai Mazumder

Captured By : Debasish Pai Mazumder

# Beyond the veil

Glacier National Park, Montana

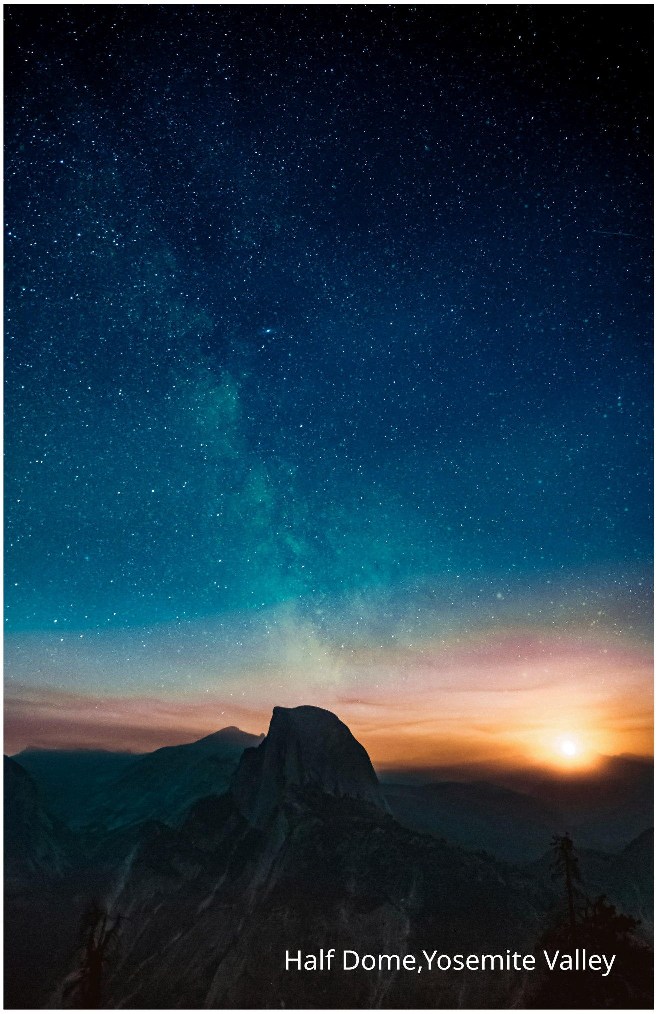

Half Dome,Yosemite Valley

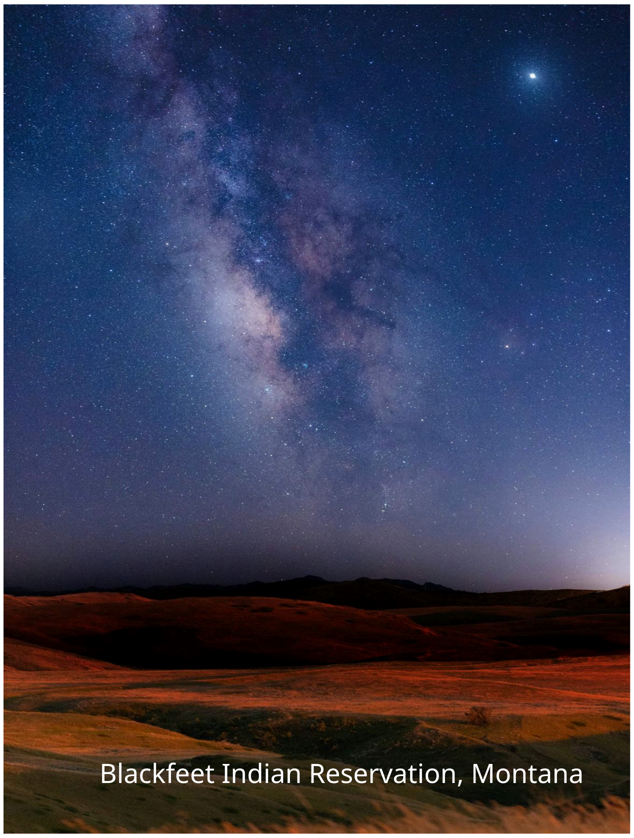

Blackfeet Indian Reservation, Montana

Captured By: Dipankar Bose

MORICHIKA

**morichikausa.org**
(856)390-2030
morichikasj@gmail.com